দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

আরেকবার দেশভাগ করতে চায় ফৈজুলরা — পৃঃ ২৮

শরজিল ইমামদের পিছনে রয়েছে জর্জ সোরোসের টাকা — পৃঃ ২৩

৭২ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা।। ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।। ২৬ মাঘ - ১৪২৬।। যুগাব্দ ৫১২১।। website : www.eswastika.com

দেশজুড়ে সিএএ বিরোধী আন্দোলনে ১২০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বিদেশি শক্তি ভারতবর্ষকে অস্থির করতে মরিয়া। প্রশ্ন উঠছে তাহলে কি

শাহিনবাগও বিদেশি টাকা?

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭২ বর্ষ ২৩ সংখ্যা, ২৬ মাঘ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

১০ ফেব্রুয়ারি - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২১,

Website : www.eswastika.com

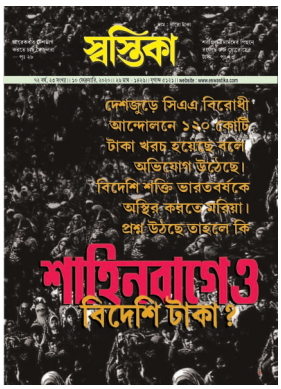

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

বর্ণাশ্রমের অপব্যাখ্যায় সংরক্ষণ ▯ দেবদত্তা **▯ ৬**

খোলা চিঠি : আগুন পোহাচ্ছেন দিদি ▯ সুন্দর মৌলিক **▯ ৭**

অত্যন্ত সদর্থক বাজেট, তবে ঘাটতির মাত্রা নিয়ন্ত্রণই চ্যালেঞ্জ ▯ সি রঙ্গরাজন **▯ ৮**

মানবতার ভেকধারী জেহাদি হায়নাদের প্রতিহত করতে হবে ▯ সাধন কুমার পাল **▯ ১১**

অন্ধকার থেকে আলোর দিশায় এগিয়ে চলেছে ভারত ▯ অরুণ কুমার **▯ ১৩**

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে জামিন পেলেন অর্চনা ▯ ধর্মানন্দ দেব **▯ ১৬**

বাংলা সিরিয়ালের ব্যাধি ঢুকেছে সংসার জীবনে ▯ রাজু সরখেল **▯ ১৮**

শরজিল ইমামদের পিছনে রয়েছে জর্জ সোরোসের টাকা ▯ দীপ্তাস্য যশ **▯ ২৩**

ঘুঘু এতদিনে ফাঁদে পড়েছে ▯ রন্তিদেব সেনগুপ্ত **▯ ২৬**

আরেকবার দেশভাগ করতে চায় ফৈজুলরা ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা **▯ ২৮**

'দ্য লাইট অব এশিয়া'য় উদ্ভাষিত শাক্যমুনির জীবন ▯ কৌশিক রায় **▯ ৩১**

কলাবউ কার বউ? ▯ দিলীপ পাল **▯ ৩৩**

মূল্যবোধের অবক্ষয় পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক ▯ ড. রতন কুমার ঘোষাল **▯ ৩৫**

আত্মঘাতী বাঙালের আস্তাকুঁড় সন্ধান ▯ কে এন মণ্ডল **▯ ৩৮**

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর কতকাল নৈরাজ্য ভোগ করবে? ▯ ডা: আর এন দাস **▯ ৪৩**

দুই মায়ের দুই উজ্জ্বল সন্তান ▯ রূপশ্রী দত্ত **▯ ৪৫**

ভারী বোঝায় হালকা শিক্ষা ▯ ডা: প্রকাশ মল্লিক **▯ ৪৯**

নিয়মিত বিভাগ

উবাচ : ১০ ▯ চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ অঙ্গনা : ২১ ▯ সুস্বাস্থ্য: ২২ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩০ ▯ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ▯ চিত্রকথা : ৪২ ▯ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৬-৪৮ ▯ সাপ্তাহিক রাশিফল : ৫০

প্রকাশিত হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

মহিলারা কেন মহাশিবরাত্রি ব্রত পালন করেন

তিনি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, মহাতাপস এবং সংসারী হয়েও সর্বত্যাগী। তিনি শিব। তিনি দেবাদিদেব মহাদেব। যুগ যুগ ধরে ভারতীয় মহিলারা শিবের আরাধনা করে আসছেন। কিন্তু কীসের আশায়? গ্রামবাঙ্গলার কিশোরী মেয়েটি শিবপুজো করে প্রিয় দেবতার কাছে কী বর প্রার্থনা করে? স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় আমরা এইসব প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজার চেষ্টা করব। মহিলারা কেন মহাশিবরাত্রি ব্রত পালন করেন— এই বিষয়ে লিখবেন এই সময়ের বিশিষ্ট লেখকরা।

সত্বর কপি বুক করুন।। দাম : বারো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank -
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী গরম মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

সম্পাদকীয়

ঘুসের অর্থে বিপ্লব

ঝুলি হইতে অবশেষে দুষ্ট মার্জারটি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। বুঝা যাইতেছে, শাহিনবাগ, জামিয়া মিলিয়া, পার্কসার্কাস ইত্যাদি অঞ্চলে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা নামক অলীক কুনাট্যটি কাহাদের প্রশ্রয়ে এবং নানাবিধ সাহায্যে মঞ্চস্থ হইতেছে। ইতিমধ্যেই তদন্তে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে যে, পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া নামক একটি মৌলবাদী ইসলামিক গোষ্ঠী সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা যাহাতে আরও তীব্র করিয়া তোলা যায়, তাহার জন্য বিভিন্ন মহলে ১২০ কোটি টাকা ঘুস দিয়াছে। এই ১২০ কোটি টাকার ভিতরে ৭৪ লক্ষ টাকাই পাইয়াছেন কংগ্রেস নেতা এবং আইনজীবী কপিল সিব্বল—এমনই অভিযোগ। এই কপিল সিব্বলই চেষ্টা করিয়াছিলেন রাম মন্দির সংক্রান্ত মামলার শুনানি এবং রায়দানটিকে প্রলম্বিত করিতে। সে কার্যে তিনি ব্যর্থ হইয়াছিলেন। বর্তমানে তিনি শাহিনবাগ আর জামিয়া মিলিয়ায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন বাতিলের দাবি তুলিতেছেন। অবশ্য ঘুসের বিনিময়ে এইভাবে আসর গরম করিতে বাজারে নামা নূতন কিছু নয়।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে জাতীয় খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ পাইয়াছিল যে, দিল্লিস্থিত কুড়িজন সাংবাদিক একটি বিশেষ রাজনৈতিক পক্ষ হইতে মাসোহারা বাবদ বেশ মোটা অর্থ পাইয়া থাকেন। পরিবর্তে শর্ত একটাই। রাহুল গান্ধী নামক এক অর্বাচীন রাজনীতিককে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রচার করিতে হইবে। যাহারা এই কাজ করেন, তাহারা কখনও মনে করেন না যে, ঘুসের বিনিময়ে গড়িয়া তোলা আন্দোলন প্রকৃতই তাসের ঘরের মতো। দমকা বাতাস দিলেই তাহা তাসের ঘরের মতোই মাটিতে লুটাইয়া পড়িবে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংঘটিত করিতে যাহারা কয়েক কোটি টাকা খরচ করিয়াছে, তাহাদের প্রতি একটু দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যাইবে, নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ একটি অছিলা মাত্র। এই বিক্ষোভের প্রকৃত উদ্দেশ্য আরো গভীর। আরও ব্যাপক ষড়যন্ত্রেরই ইঙ্গিত দেয় তাহা।

দেশের একটি আইনের বিরোধিতা করা বা সমালোচনা করার অধিকার প্রতিটি দেশবাসীর রহিয়াছে। সেটি তাহার সংবিধানসম্মত গণতান্ত্রিক অধিকার। কাজেই কেহ যদি সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করিতে চাহেন, অথবা করেন—তাহাকে সেই পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেই হইবে। কিন্তু কেহ যদি ওই সভা হইতে দাবি তোলেন, জিন্নাওয়ালি আজাদি চাহিয়ে—তাহা হইলে সন্দেহ হয়, সংশয় হয়। কেহ যদি এই সভায় বলে—অসম-সহ সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলকে অবশিষ্ট ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিব—তাহা হইলে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেই সন্দেহ জাগে। মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, ইহারা কি সত্যই নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতায় রাস্তায় নামিয়াছে, নাকি জিন্নাওয়ালি আজাদির দাবিতে আন্দোলন করিতেছে? এরা কি সত্যই ভারতকে এক ও অখণ্ড রাখিতে চাহে, নাকি আর একবার ভারতকে খণ্ড-বিখণ্ড করিতে চায়? আর এই জিন্নাওয়ালি আজাদির দাবি যাহারা করিতেছে, তাহাদের আন্দোলন সচল রাখিবার জন্য যখন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া একশো কুড়ি কোটি টাকা ঘুস দেয়—তখন ইহা বুঝিতে অসুবিধা হয় না, অর্থের বিনিময়ে দেশকে টুকরা টুকরা করিবার জন্য একটি গোষ্ঠী আবার দেশের অভ্যন্তরে সক্রিয় হইয়াছে। ইহাদের চিহ্নিত করা এবং সামাজিকভাবে ইহাদের তথাকথিত আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করাই এই মুহূর্তের আশু কর্তব্য।

সুভাষিতম্

যস্য পুত্রো ন বিদ্বান্ স্যাৎ ন শূরো ন চ পণ্ডিতঃ।

অন্ধকারং কুলং তস্য নষ্টচন্দ্রের শর্বরী।। (চাণক্য শ্লোক)

যার পুত্র বিদ্বান, পরাক্রমশালী ও পণ্ডিত নয়, তার বংশ চন্দ্রহীন রজনীর মতোই অন্ধকারময়।

বর্ণাশ্রমের অপব্যাখ্যায় সংরক্ষণ

দেবদত্তা

ভারতবর্ষের রাজনীতিতে স্বাধীনতার পর থেকে এক শ্রেণীর মানুষ নিজেদের নিম্নবর্ণের বলে পরিচয় দিয়ে বর্ণাশ্রমের অপব্যাখ্যা করে বংশানুক্রমে সংরক্ষণের মধ্যে দিয়ে যেমন ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে চাইছে, তেমনি হিন্দু সমাজকে আঘাত করে আরও ভাঙতে ভাঙতে দেশটাকেই ক্রমশ দুর্বল করে চলেছে। আমরা প্রত্যেকে যদি শ্রীকৃষ্ণ বর্ণিত বর্ণাশ্রমের কর্ম ও গুণের উত্তরণ ঘটিয়ে ব্রহ্মত্ব অর্জন করে চলতাম তবে শুধু দেশ নয়, পুরো সমাজেরই উন্নতি হতো।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জাতি ও বংশ বিচার করে মানুষকে চারটে ভাগে ভাগ করে বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করেননি। তিনি বিচার করেছিলেন মানুষের গুণ ও কর্মের উপর ভিত্তি করে।

কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজপতিরা এক সময় বংশগত অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখতে যেমন বর্ণাশ্রমকে জাতিগত এবং বংশগত রূপ দিয়ে সমাজকে বিভক্ত করেছে, ঠিক একই ভাবে আজ তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষও বর্ণাশ্রমের অপব্যাখ্যা করে কোটা ব্যবস্থা দ্বারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে সমাজকে ভাগ করে ভারতবর্ষকে পঙ্গু করে চলেছে। অন্যদিকে আমাদের সংবিধানও জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে সাম্যের কথা বললেও বাস্তবে জাতিভেদকেই মান্যতা দিয়েছে। জাতি বিশ্লেষণ করে সংরক্ষণের স্বীকৃতি দিয়ে বর্ণাশ্রমের বিকৃত রূপ প্রতিষ্ঠা করেছে।

বর্তমান ভারতবর্ষে আজ এই জাতিগত সংরক্ষণকে কেন্দ্র করেই অশান্তির আগুন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। বিভিন্ন জাতি নিজেকে নিম্নবর্ণের পরিচয় দিয়ে সংরক্ষণের তালিকাভুক্ত হতে আন্দোলন করছে। পঞ্জাব, রাজস্থানে গুর্জর জাঠেদের মতো, গুজরাটে প্যাটেলদের মতো সম্পন্ন মানুষেরা; বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্রে এবং দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায় --- উচ্চবিত্ত হয়েও সংরক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে চেয়ে মারমুখী এবং ধ্বংসাত্মক আন্দোলন করছে। যার ফলে দেশের স্থিতিশীলতাই আজ ধ্বংসের মুখে।

সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, মুসলমানরা বলে থাকে, হিন্দু সমাজের শ্রেণী বিভাজনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে সমান অধিকারের জন্য এবং হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রমের প্রতিবাদে তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম কবুল করেছে। কারণ ইসলামে শ্রেণীবিভাজনের কোনো জায়গা নেই। অথচ তারাই আবার ঘুরপথে বিকৃত বর্ণাশ্রমকে মান্যতা দিয়ে সংরক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। অন্যদিকে ব্রাহ্মণরাও আজ সংরক্ষণের দাবিতে সোচ্চার। কোটার আঘাতে মেধা আজ কোমায়। ফলস্বরূপ, জাতি দাঙ্গা আজ ভারতের নিত্য সঙ্গী। তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা সংরক্ষণের সুযোগ নিয়ে বংশ পরম্পরায় সব সুযোগ সুবিধা কুক্ষিগত করে ঠিক পূর্বের তথাকথিত ব্রাহ্মণদের মতোই নতুন এক বিভেদকামী শক্তিতে পরিণত হয়েছে।

জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দুর্বল মানুষদের জন্য সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাকেন্দ্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় সরকার সাম্যর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বর্ণাশ্রমের আসল রূপের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। জাত-পত-ধর্মের হানহানি মুক্ত ও বিভেদহীন ভারত গড়তে এই সংরক্ষণ এক নতুন আলোর পথ দেখাবে।

অর্থনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীরাও কোনোদিন শ্রেণী সংরক্ষণের বিরোধিতা করেননি। উল্টে জাতিভেদকে সাংবিধানিক মান্যতা দিয়ে বিভেদের বিষবৃক্ষকে দিন দিন আরও বড়ো হতে সাহায্য করেছে। ধর্মীয় ও জাতিগত দিক বিচার না করে অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বিচার করে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করলে দেশ ও সমাজের যে অনেক উন্নতি হতো এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। অন্যদিকে জাতিগত বিদ্বেষ ও হিংসার ক্ষেত্র তৈরি হতো না।

শ্রেণীহীন ও স্থিতিশীল সমাজ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ যখনই জাতিগত সংরক্ষণের যৌক্তিকতার প্রশ্ন তুলে বিরোধিতা করে এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের কথা বলেছে, তখনই দেশের তামাম বুদ্ধিজীবী থেকে রাজনৈতিক দল মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ভ্রাতৃঘাতী হানাহানিতে লিপ্ত হতে ইন্ধন জুগিয়েছে। যেসব রাজনৈতিক দল যারা এই জাতিগত সংরক্ষণের পক্ষে তাদের কাছে প্রশ্ন এই ব্যবস্থা আর কত দিন চলতে পারে। এই সংরক্ষণ কি সামাজিক বৈষম্য ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে না? এর ফলে কি স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়ে দেশ দুর্বল হচ্ছে না। জাতির নামে সংরক্ষণের অর্থই হলো— কবি নজরুলের ইসলামের কথায়— জাতের নামে বজ্জাতি। কী আশ্চর্য বিষয়। যারা জাতিভেদের বিনাশ চাইছে তারাই আবার জাতির নামে সংরক্ষণের পক্ষপাতী।

২০১৯-এর ৯ জানুয়ারি ভারতে নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে। ভারতবাসী এক ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছে। জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দুর্বল মানুষদের জন্য সরকারি চাকরি এবং শিক্ষাকেন্দ্রে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে কেন্দ্রীয় সরকার সাম্যর প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে বর্ণাশ্রমের আসল রূপের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। জাত-পত-ধর্মের হানহানি মুক্ত ও বিভেদহীন ভারত গড়তে এই সংরক্ষণ এক নতুন আলোর পথ দেখাবে।

আগুন পোহাচ্ছেন দিদি

শাহিনবাগের বিক্ষোভ নিয়ে এবার মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দিল্লির সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে মোদী বললেন, ''জামিয়া, শাহিনবাগের আন্দোলনের নেপথ্যে রাজনীতি রয়েছে। দেশের সম্প্রীতি নষ্ট করতে একটা রাজনৈতিক চক্রান্ত এটা''। একইসঙ্গে এ ইস্যুতে দিল্লি ভোটের মুখে আপ ও কংগ্রেসকে নিশানা করে মোদীর তোপ, ''আপ ও কংগ্রেস উস্কানিমূলক আচরণ করছে''।

দিল্লির কড়কড়ডুমার সভায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ''এইসব আন্দোলনের পিছনে একটা রাজনৈতিক নকশা রয়েছে। যদি একটি আইনের বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ চলত, তাহলে সরকারের আশ্বাসের পর তা শেষ হতো। কিন্তু আপ ও কংগ্রেস উস্কানিমূলক আচরণ করছে''। নমো আরও বলেন, দেশকে টুকরো টুকরো করতে চায় যারা, তাদের রক্ষা করছে। যারা রক্ষা করছে, তারাই ভারতীয় সেনার সার্জিক্যাল স্ট্রাইক নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিল। এরপরই মোদী বলেন, ''সীলমপুর হোক, কী জামিয়া বা শাহিনবাগ, গত কয়েকদিন ধরে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে। এটা কি শুধুই কাকতালীয়? না, এটার পিছনে রাজনীতি রয়েছে''।

না, প্রধানমন্ত্রী একজনের নাম বলেননি। বলেননি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। আসলে এই বক্তব্য ছিল দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার সভায়। সেখানে মমতা বা তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও যোগাযোগ নেই। আবার আছেও। পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস ফতোয়া দিয়েছে আপকে ভোট দেওয়ার

জন্য। এই চিঠি যখন পড়ছেন তখন দিল্লির ভোটাররা তাঁদের রায় দিয়ে দিয়েছেন। তৃণমূল কংগ্রেসকে 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' বলেই হয়তো ভেবে নিয়ে ভোট দিয়েছেন তাঁরা। হয়তো কেন সেটা ভাবাই তো স্বাভাবিক।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভুল বোঝানোর রাজনীতি একটু হলেও স্তিমিত। এখন আর রোজ মাচা বেঁধে সিএএ বিরোধী সভা করছেন না। রোজ মাইল মাইল হাঁটছেন না। বুঝে গেছেন হেঁটে, চেঁচিয়ে বেশি লাভ নেই। কেন্দ্র চাইলে কাগজ দেখাতেই হবে। যেসব বুদ্ধিজীবীদের 'কাগজ আমি দেখাব না' বলতে বাধ্য করেছিলেন তাঁরাও আর পাশে নেই। সবাই এখন বুঝে গেছে চাইলে কাগজ দেখাতে হবে। সেটা এখনও মানতে পারছে না পার্কসার্কাস, মেটিয়াবুরুজ। তাঁরা এখনও এই দেশে থাকার মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

কারণ, তাঁদের যে এটা মরণ বাঁচন লড়াই। দিদির আশ্রয়ে যে সব বাংলাদেশিরা দিনের পর দিন এই রাজ্যে বহাল তবিয়তে রয়ে গেছেন তাঁরা এখন বুঝতে পেরেছেন সেইদিন আর নেই। কেন্দ্রে এমন এক সরকার যারা আপোশ করতে জানে না।

এদিকে দিদির হয়েছে আর এক বিপদ। এই রাজ্যের মুসলমান ভোটাররাও দিদির আস্ফালনে ভরসা রাখছেন না। অনুপ্রবেশকারীদের পক্ষ নিতে গিয়ে দিদি এখন রাজ্যে বৈধভাবে বসবাসকারী মুসলমান ভোটারদের আস্থাও হারাতে চলেছেন। তাই তো রাতের ঘুম ছুটে গেছে। মিছিল মিটিং করেছেন সেই ঘুম ছুটে যাওয়ার জন্যই। কিন্তু আর নয়। দিদি এখন নতুন পথ খুঁজছেন। আর তাকিয়ে আছেন দিল্লির ভোটের দিকে। সেই ভোটই বলে দেবে শাহিনবাগ, পার্কসার্কাসের আয়ু আর কতদিন।

সংবাদমাধ্যমের হাতে হাওয়া খেয়ে ফুলে থাকা শাহিনবাগ নামক বেলুন চুপসে যাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

—সুন্দর মৌলিক

অত্যন্ত সদর্থক বাজেট তবে রাজস্ব ঘাটতির মাত্রা নিয়ন্ত্রণই চ্যালেঞ্জ

অতিথি কলম

সি. রঙ্গরাজন

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের এই দ্বিতীয় বাজেটে উপস্থাপনের প্রেক্ষাপটে ছিল উপর্যুপরি ৬টি ত্রৈমাসিকে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিম্নগামিতা। অন্যদিকে বাৎসরিক বাজেট ঘাটতির যে লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট ছিল সরকারি খরচ আরও বাড়িয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে বেগবান করার চেষ্টা করলে সেই ঘাটতি আরও ব্যাপক হয়ে পড়ার সম্ভাবনাও ছিল। তবুও ২০২০-২১ অর্থবর্ষের এই সম্ভাব্য আগাম হিসেব- নিকেশকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ চড়ছিলই। এর মূলে ছিল আগে বলা কী পরিপ্রেক্ষিতে বাজেট তৈরি করার বাধ্যবাধকতা ছিল। অর্থনীতিতে তিনটি নির্দিষ্ট ক্ষতিকারক প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছিল— (১) বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নজরে পড়ার মতো শ্লথতা, (২) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড়োসড়ো নিম্নমুখিতা, (৩) অর্থনৈতিক পদ্ধতির ওপরই একধরনের চাপ। এই বিষয়গুলি থেকে বেরিয়ে আসার উপায় নির্ধারণের সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নে দ্রুত গতি ফেরাবার বুনিয়াদ তৈরি করতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেগুলির দিকেই ছিল নজর। কেননা এই পথ নির্দেশ ঠিক না করতে পারলে ৫ ট্রিলিয়ন অর্থনীতিতে পৌঁছনোর স্বপ্ন অধরাই থেকে যাবে।

গোটা বাজেট প্রস্তাবে অর্থনীতিতে স্লো-ডাউনের বিষয়টি একবারও উল্লেখ না করলেও বাজেটের অভিমুখ নিঃসন্দেহে শুভ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বাজেটের মাধ্যমে বহুমুখী উন্নয়নের যে পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে তার রূপরেখা সবিস্তারে দেওয়া হয়েছে। এই সূত্রে সরকারি তহবিল থেকে ক্ষেত্র অনুযায়ী খরচের যে প্রস্তাব রাখা হয়েছে তা থেকে বাজারে চাহিদার ক্ষেত্রে বৃদ্ধি ঘটানোর যথেষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। একইভাবে খরচের সঙ্গে আয়ের সামঞ্জস্য রেখে রাজস্ব ঘাটতিকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে তার বিবরণের মাধ্যমে এই ধরনের খরচ যে আদতে ফলদায়ী ও দীর্ঘমেয়াদিভাবে অর্থনৈতিক বৃদ্ধির সহায়ক হবে তাও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অবশ্য এই পরিকল্পনার ওপর আমরাও পুনর্দৃষ্টিপাত করব।

এই বছরের রাজস্ব ঘাটতি ৩.৮ শতাংশ থাকবে এটাই ধরা হয়েছে। পক্ষান্তরে ২০২০-২১-এর প্রস্তাবিত বাজেটে এই ঘাটতি ৩.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে। যদিও আপাতদৃষ্টিতে ঘাটতি জিডিপি-র ৩ শতাংশের ওপর না যাওয়ার যে অলিখিত বিধি আছে ৩.৮ বা ৩.৫ শতাংশের মাত্রা রাখায় তা লঙ্ঘিত হলেও বাজারে চাহিদার পুনরুত্থানের ক্ষেত্রে যেখানে সরকারের তরফে বড়ো ধরনের খরচ করা আবশ্যিক হয়ে পড়ে সেই নিরিখে এই উলঙ্ঘন অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু একটাই কথা এই ৩.৫ শতাংশের প্রস্তাবিত ঘাটতির মধ্যেই কি অর্থনীতিকে ধরে রাখা যাবে?

বাজারের মুদ্রাস্ফীতির হার ও অন্যান্য কিছু অর্থনীতির জরুরি বিষয়কে বাদ দিয়ে ২০১৯-২০-তে নামমাত্র জিডিপি বৃদ্ধির হার ১০ শতাংশ। এটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত। মোট কর আদায়ে আগামী বর্ষে ১২ শতাংশ বৃদ্ধি ধরা হয়েছে।

এ থেকে পরিষ্কার এই যে, প্রস্তাবিত পূর্বানুমান তা এই বছরের ১০ শতাংশের জিডিপি (নামমাত্র) বৃদ্ধির থেকে আগামী বছরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে (করে ১২ শতাংশ বড়তি আদায় হওয়ার কারণে)। ঘাটতি নিয়ন্ত্রণে বিলগ্নীকরণের ওপর নির্ভরতা বিপুল। এক্ষেত্রে এল আই সি-র শেয়ারের একটা অংশ বিক্রি থেকে বড়ো অর্থাগমের সাফল্য আসবে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে অতীতে একবারও বিলগ্নীকরণের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি।

অর্থমন্ত্রকের দায়িত্ব কিন্তু কঠিন। তাদের সব সময় কড়া নজর রাখতে হবে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রগুলিতে যেন কোনো ফাঁক না থাকে। রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হলেই বাড়তি খরচ যা করা হবে তার সঙ্গে তাল মেলানো যাবে না। রাজস্ব ঘাটতিকে প্রস্তাবিত সীমায় ধরে রাখতে এই সতর্কতা জরুরি। বস্তুত, খরচের যে মাত্রা ধরা হয়েছে তার প্রভাবে রাজস্ব ঘাটতির ৩.৫ শতাংশকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। এক্ষেত্রে আগে বলা ৩-এর ওপর .০৫ বা .০৮ শতাংশের যে বাড়তি মাত্রাকে মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়া হয়েছে তাকে টপকে যাওয়া আদৌ গ্রহণীয় হবে না। আশা করা যায় তেমন পরিস্থিতি সরকার এড়াবারই চেষ্টা করবে যাতে না আর বি আই-কে আবার বাজারে সরকারি ঋণপত্র বেচে টাকার ঘাটতি মেটাতে সরকারকে সাহায্য করতে হয়।

কর ব্যবস্থায় কয়েকটি পরিবর্তন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক মাস আগেই কোম্পানি করের ক্ষেত্রে সরকার যথেষ্ট নমনীয়তা দেখিয়ে কর হার কমিয়েছে। এই বাজেটে ব্যক্তিগত করের ক্ষেত্র সরলীকরণ করতে সরকার বেশ কয়েকটি ব্যবস্থা নিয়েছে। এর প্রভাব হয়তো খুব ব্যাপক হবে না। আমার ধারণায় কর হার কমানোর সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের ছাড় প্রত্যাহার করে নেওয়ার ক্ষেত্রে সরকার যে দু' ধরনের ব্যবস্থা চালু রেখেছে তা ভবিষ্যতে আরও সংশোধন করা দরকার। কোন ধরনের বিকল্প মধ্যপন্থার বদলে কেবলমাত্র বিভিন্ন স্তরে করের মাত্রাভেদই থাকবে, ছাড় নয়। বাজেটে এমন কিছু প্রস্তাব রয়েছে যার ফলে বিদেশ থেকে টাকা আসার পথ সুগম হবে। কোম্পানি তার লাভের ওপর সরকারকে কর দেয়, আবার শেয়ার হোল্ডারদের সেই লভ্যাংশ বিতরণের ওপর আবার যে কর আদায় করা হতো তা তুলে দেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে বিদেশ থেকে ভারতীয় টাকায় সরকারি ঋণপত্র কেনার ছাড়পত্র দেওয়া হলেও এই ঋণপত্র মাত্রাছাড়া ভাবে বিক্রি করলে সরকারি দেনা বেড়ে যাবে।

অবশ্যই অর্থমন্ত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে কীভাবে, কী মাত্রায় খরচের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা বোঝাতে যথেষ্ট মনঃসংযোগ করেছেন। এখন ক্ষেত্র বিশেষজ্ঞরা পর্যালোচনা

করবেন এই খরচগুলি কতটা প্রাসঙ্গিক। সবচেয়ে বড়ো কথা, শেষমেশ প্রকল্পগুলি কীভাবে বাস্তবায়িত হবে। এ প্রসঙ্গে অর্থনৈতিক ক্ষেত্র সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক প্রচলিত ব্যবস্থায় শুরু হওয়া সংস্কারগুলিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জরুরি। যেমন, ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে অনেকগুলি ব্যাঙ্কের কোনো একটি ব্যাঙ্কের সঙ্গে বিলয় ঘটিয়ে দেওয়াই মুখ্য বিষয় নয়। সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাঙ্কগুলির সার্বিক মালিকানার কত শতাংশ সরকার তার হাতে রাখবে। এই সূত্রে আইডিবিআই-এর বেসরকারিকরণের প্রস্তাব ইঙ্গিতবহ। তবুও আরও পরিষ্কার দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, সরকারি ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন পর্ষদের ক্ষেত্রে সরকারের ভূমিকা সুনিশ্চিত করা দরকার। মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ হলেই সংস্থার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পায় না। তা নির্ভর করে সংস্থার মূলগত ধাঁচার ওপর। আবার বলছি এই বাজেট থেকে চাহিদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া ও সার্বিক সম্পদ বৃদ্ধি পেয়ে যাতে মূলধন সৃষ্টি হয় এই দুটি প্রত্যাশা ছিল। এক্ষেত্রে সরকার যে ছাঁচ তৈরি করেছে, যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করেছে তা নিশ্চিতভাবেই অর্থনীতিতে চাহিদা বৃদ্ধির পূর্ণ সহায়ক। যদি এই খরচগুলি তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পূর্ণ উদ্যোগ, সততা ও দায়বদ্ধতা নিয়ে বাস্তবায়িত হয় তাহলে লক্ষ্য পূরণের পথে অগ্রগতি নিশ্চিত। রূপায়ণই হচ্ছে শেষ কথা। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র বিনিয়োগ (শিল্প), এক্ষেত্রে সরকারের অংশগ্রহণ এখনও সীমিত। ২০২০-২১-এর বাজেটে যে ৩.৫ শতাংশ প্রস্তাবিত ঘাটতি ধরা হয়েছে তার ২.৭ শতাংশই হলো চলতি খাতে (আমদানি-রপ্তানি, কর আদায়, পরিকাঠামো, নির্মাণ পরিষেবা, ভরতুকি ইত্যাদি)। বিনিয়োগ খাতে খরচের জন্য ঘাটতি নগণ্য।

মনে রাখতে হবে, সরকারের মূলধনী খরচের বেশিরভাগটাই বাজেটের বাইরে থেকে আসা সম্পদের ভিত্তিতে। সেই কারণেই বেসরকারি বিনিয়োগ আসার গুরুত্ব অসীম। এই বাজেটের সামগ্রিক প্রভাব কি বেসরকারি বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে উজ্জীবিত করবে? আশা করতেই হবে।

(লেখক আর বি আই-এর পূর্বতন গভর্নর)

শোক সংবাদ

উত্তর কলকাতার টালা শাখার একনিষ্ঠ স্বয়ংসেবক ভূপেশ চন্দ্র কুণ্ডু গত ১৬ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। উল্লেখ্য, তিনি এলাকায় বুধোদা নাম পরিচিত ছিলেন। তাঁর বড়ো দাদা প্রয়াত দিবাকর কুণ্ডু। বুধোদা টালা শাখার প্রাণস্বরূপ ছিলেন। বাল্যকাল থেকে সঙ্ঘের বিভিন্ন দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। টালা শাখায় পরম পূজনীয় শ্রীগুরুজী যখন এসেছিলেন তখন তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অতি দক্ষিণ ভাগের সূর্যসেন নগরের ভরত শাখার স্বয়ংসেবক তথা নগর ব্যবস্থা প্রমুখ জয়হিন্দ শর্মার পিতৃদেব ফুলচন্দ্র শর্মা গত ১৩ জানুয়ারি পরলোকগমন করেন। মৃতুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর। তিনি ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

ঠাকুরপুকুর শাখার স্বয়ংসেবক নিউটন হালদারের মা নীলিমা হালদার পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বছর। তিনি স্বামী, ১ পুত্র, ১ কন্যা রেখে গেছেন।

* * *

কলকাতা অতি দক্ষিণ ভাগের বিশ্বামিত্র শাখার স্বয়ংসেবক তথা নগর কার্যবাহ রতন মল্লিকের মা ছায়া মল্লিক পরলোকগমন করেন। তিনি ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হাওড়া মহানগর বৌদ্ধিক প্রমুখ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠীর মাতৃদেবী শিবানী ত্রিপাঠী গত ২২ জানুয়ারি পূর্বমেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের পুরুষোত্তমপুর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। তিনি ২ পুত্র, ২ পুত্রবধূ, ৪ কন্যা, ৪ জামাতা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

অনিবার্য কারণবশত স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্ট পরিবর্তিত হয়ে ১লা জুলাই ২০১৯ থেকে ওঁস্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড হচ্ছে। তাই

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪, ৮৬৯৭৭৩৫২১৫, হোয়াটস্ অ্যাপ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name	:	**OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**
A/C. No.	:	**917020084983100**
IFSC Code	:	**UTIB0000005**
Bank Name	:	**AXIS Bank Ltd.**
Branch	:	**Shakespeare Sarani, Kolkata**

রম্যরচনা

টক মিষ্টি

প্রশ্ন : দুর্নীতিমুক্ত ভারত কে চায়?

উত্তর : সবাই।

প্রশ্ন : কতজন লোক তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোনোভাবেই ঘুষ নেন না?

উত্তর : কেউ না।

প্রশ্ন : কতজন দূষণহীন বায়ুমণ্ডল চায়?

উত্তর : সবাই।

প্রশ্ন : কারা কারা পলিথিন বর্জন করেছেন?

উত্তর : কেউ না।

প্রশ্ন : টাকার পতন নিয়ে কত লোক চিন্তিত?

উত্তর : সবাই।

প্রশ্ন : কতজন লোক কেবল দেশীয় জিনিস কিনি?

উত্তর : কেউ না।

প্রশ্ন : অবনতিশীল ট্র্যাফিক ব্যবস্থার উপর কে কে বিরক্ত?

উত্তর : সবাই।

প্রশ্ন : ১০০ শতাংশ ট্র্যাফিক বিধি অনুসরণ করে কে কে?

উত্তর : কেউ না।

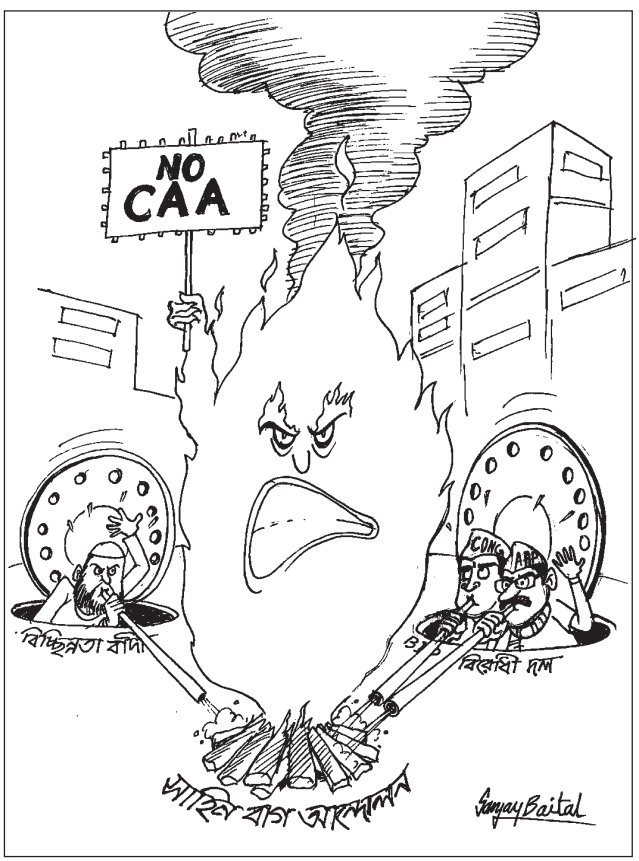

উবাচ

“মমতার মতো অভিনেত্রী হয় না। সংসদে তিনিই শরণার্থীদের নাগরিকত্বের দাবিতে স্পিকারের দিকে কাগজ ছুঁড়ে বিক্ষোভ দেখিয়ে নাটক করেছিলেন। আইন তৈরি হওয়ার পর তিনি আবার বিরোধিতা করছেন।”

ড. সুরেন্দ্র জৈন
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক

কলকাতার হরিয়ানা ভবনের সভায়

“মমতা ব্যানার্জি হিন্দু বাঙ্গালি ও শরণার্থী বিদ্বেষী হয়ে সিএএ-র বিরোধিতা করছেন। কিছু জেহাদি মুসলমানকে লেলিয়ে দিয়ে সিএএ বিরোধী অপপ্রচার চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।”

রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়
রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক

শিলিগুড়িতে অভিনন্দন যাত্রায়

“শাহিনবাগ আন্দোলনের শিকড় রাজনীতিতে। শুধু আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হলে সরকারের আশ্বাসের পরেই তা থেমে যেত। ভোটের তাগিদে কংগ্রেস এবং আম আদমি পার্টির সংখ্যালঘু তোষণের পরিণতি এটি।”

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

শাহিনবাগে আন্দোলন প্রসঙ্গে

“আপনি (অরবিন্দ কেজরিওয়াল) নিজেই নিজেকে নৈরাজ্যবাদী বলে দাবি করে থাকেন। আমি বলছি একজন নৈরাজ্যবাদী আর জঙ্গির মধ্যে বলতে গেলে খুব বেশি পার্থক্য নেই।”

প্রকাশ জাভড়েকর
কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

দিল্লির নির্বাচনী জনসভায়

মানবতার ভেকধারী জেহাদি হায়নাদের প্রতিহত করতে হবে

সাধন কুমার পাল

টেলিভিশনে দিল্লির রাজপথে ৭১ তম সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে দেশের শক্তি ও সংস্কৃতির প্রদর্শন দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল বহিঃশত্রুদের চোখরাঙানি থেকে দেশের মানুষকে সুরক্ষার বার্তা দেওয়া সেই সঙ্গে অপশক্তিকে সতর্ক করে দেওয়া এবং দেশের অনুপম সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরতেই এত বড়ো আয়োজন। সিএএ বিরোধিতার নামে দেশব্যাপী অপশক্তির উল্লাসের আবহে অনুষ্ঠিত ৭১তম গণতন্ত্র দিবসের প্যারেড যতই এগোচ্ছিল ততই মনে হচ্ছিল বহিঃশত্রুর চেয়ে এই মুহূর্তে দেশের ভিতরে সাধারণ নাগরিকের ছদ্মবেশে সক্রিয় দেশের শত্রুদেরও কঠোর বার্তা দেওয়ার কোনো আয়োজন থাকলে ভালো হতো।

সিএএ-র বিরোধিতার নামে দেশ জুড়ে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস, দেশবিরোধী স্লোগান দিয়ে জেহাদি শক্তির দাপিয়ে বেড়ানো থেকে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে সাতচল্লিশে দেশভাগ হলেও বিগত সত্তর বছর ধরে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতির দৌলতে দেশভাগের জীবাণুরা আবার নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করে ফেলেছে। এদের শক্তির কাছে সংখ্যালঘু ভোটব্যাঙ্ক নির্ভর রাজনৈতিক দলগুলির অসহায় আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। ২০০১ সালে লস্কর-ই-তৈবা ও জৈশ-ই-মহম্মদদের সন্ত্রাসবাদীরা সংসদের স্টিকার লাগানো গাড়ি নিয়ে সংসদ ভবন আক্রমণ করেছিল। ২০১৯-২০ সালে সিএএ বিরোধী আন্দোলনের নামে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে, মহাত্মা গান্ধীর ছবি নিয়ে, অনেক জায়গায় সংবিধানের কপি হাতে নিয়ে গণতন্ত্র ও সংবিধান রক্ষার নামে হিংসাত্মক আন্দোলন করছে, প্রকাশ্যে দেশকে টুকরো টুকরো করার স্লোগান তুলছে।

সম্প্রতি ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োতে দিল্লির শাহিনবাগে মুসলমান মহিলা ও শিশুদের সিএএ-র বিরোধিতার অজুহাতে এক মাসের বেশি সময় ধরে দিল্লির গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা বন্ধ করে পরিকল্পিত অবস্থান আন্দোলনের কোঅর্ডিনেশন কমিটির প্রধান জেএনইউ-এর প্রাক্তন ছাত্র শরজিল ইমামকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ''যদি আমাদের পাঁচ লক্ষ সংগঠিত মানুষ থাকতো তাহলে উত্তরপূর্ব ভারতকে স্থায়ী ভাবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারতাম। স্থায়ী ভাবে না হলেও এক মাসের জন্য বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারতাম। রেলের ট্র্যাক ও রাস্তাগুলি এমন ভাবে জ্যাম করে দিতে হবে যাতে এক মাসেও ওরা সেগুলি সরাতে না পারে। যদি তারা সেখানে যেতে চায় তাহলে বায়ুপথে যেতে বাধ্য হবে।'' শরজিল ইমামকে আরও বলতে শোনা যাচ্ছে, 'আপনারা জানেন অসমে মুসলমানদের উপর কী হচ্ছে? ওখানে এনআরসি প্রয়োগ করে মুসলমানদের ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে। ওখানে ম্যাসেকার হচ্ছে। আমরা জানতে পেরেছি বিগত ৬-৮ মাসে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙ্গালিদের হত্যা করা হয়েছে। যদি আমরা অসমকে সাহায্য করতে চাই তা হলে অসমে আর্মি যাতায়াত ও অন্যান্য রসদের ও জোগান বন্ধ করতে হবে।'

> **হিন্দুদের অত্যাচারিত হওয়ার এই পরম্পরা শুধু বাংলাদেশ, পাকিস্তান আফগানিস্তানে নয়, হিন্দুবহুল ভারতের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এখনো ঘটে চলেছে। যেমন মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা বাংলাদেশের হিন্দুদের মতোই আতঙ্কে দিন যাপন করে। কিন্তু হিন্দুরা এর প্রতিবাদে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালিয়েছে এমন নজির নেই।**

আরেকটি ভিডিয়োতে ইমামকে বলতে শোনা গেছে, 'ব্রিটিশ শাসনের শেষ পঞ্চাশ বছরে মুসলমানদের অবস্থা স্বাধীন ভারতের পঞ্চাশ বছরের চেয়ে ভালো ছিল। আমাদের এটা স্পষ্ট করে বলতে হবে যে, ১৯৪৭ সালে আমরা স্বাধীনতা পাইনি, আমরা শুধু মাত্র বাজে ধরনের গুলামি পেয়েছি। শিক্ষিত মুসলমানরা স্পষ্ট করে সরাসরি এই কথা বলতে শুরু করলে আমজনতা আমাদের অনুসরণ করবে এবং বলতে শুরু করবে।' ইমামকে বলতে শোনা যায়, 'আমাদের ইনটেলেকচ্যুয়াল গ্রুপ তৈরি করতে হবে এই গ্রুপের গান্ধীজী কিংবা ভারতের প্রতি কোনো সহানুভূতি থাকবে না এবং শত্রু সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকবে। আমাদের অবশ্যই জেনে রাখা প্রয়োজন গান্ধীজী নিজে ছিলেন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড়ো ফ্যাসিস্ট নেতা।...'

স্বাধীনতা পূর্ব সময়েও মুসলিম লিগের নেতারা কংগ্রেসকে হিন্দুদের দল গান্ধীজীকে হিন্দুনেতা বলে অভিহিত করলেও তৎকালীন জাতীয় নেতৃত্ব এই বিষয়গুলিকে গুরুত্ব না দিয়ে নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে তুলে ধরে মুসলমানদের মন জয় করার জন্য নানা কর্মসূচি নিতেন। যেমন

গান্ধীজী খিলাফত আন্দোলনে নেমেছিলেন। জাতীয় নেতাদের এই অদূরদর্শী ভ্রান্ত নীতির পরিণামে রচিত হয়েছিল অভিশপ্ত দেশভাগ, গণহত্যা, কোটি কোটি হিন্দুর বাস্তুচ্যুত হওয়ার ইতিহাস।

সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে গুজবের জেরে সংখ্যালঘুরা পথে নামলো, ট্রেন পুড়ল বাস, পুড়ল সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস হলো, প্রতিবাদের নামে দিনের পর দিন দেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা অবরুদ্ধ হয়ে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে থাকলো। সিএএ নিয়ে প্রতিবাদের নামে হিংসা দেখে ২০১৭ সালের জুলাই মাসে ১৭ বছর বয়সের এক কিশোরের ফেসবুক পোস্টকে ঘিরে বাদুরিয়া, বসিরহাট, তেতুলিয়ায় ছড়িয়ে পড়া হিন্দুদের ওপর আক্রমণের জেরে ঘটানো ধ্বংসযজ্ঞের কথা মনে পড়ছে। ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে ২০১৭ সালের জুলাই পর্যন্ত সময় কালের মধ্যে নগণ্য কারণে মালদা, ধুলাগড়, বর্ধমান-সহ বিভিন্ন জায়গায় কম করে সাতটি হিন্দু বিরোধী হিংসার ঘটনা ঘটেছে। সেই পরম্পরা এখনো নিয়ম করেই ঘটে চলেছে, সেসব খবর কখনো মিডিয়ায় আসছে আবার কখনো আসছে না। পাকিস্তানে বাংলাদেশেও কোনো গুজব রটিয়ে দিয়ে কিংবা ইচ্ছাকৃত ভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তির নাম করে ভুয়ো সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনা হামেশাই ঘটছে।

হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতে মুসলমানদের পক্ষে পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করা সম্ভব নয় সে জন্যই শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্যই পাকিস্তান নামে একটি পৃথক দেশ চাই। মুসলিম লিগের পাকিস্তানের দাবি এই কল্পিত তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির ২৩ বছর পর ওই দেশ ভাগ হয়ে আরেকটি ইসলামিক দেশ বাংলাদেশের জন্ম, সেই সঙ্গে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের প্রশ্নাতীত স্বাচ্ছন্দ্য প্রমাণ করে দিয়েছে যে একটি সাজানো মিথ্যেকে ভিত্তি করেই জন্ম হয়েছিল পাকিস্তানের। পাকিস্তানের দাবি আদায়ের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নামে কলকাতা ও নোয়াখালিতে হিন্দু নিধন যজ্ঞ চালানো হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে একের পর এক আক্রমণে হিন্দুনিধন যজ্ঞ চালানো হয়েছে। ফলস্বরূপ পাকিস্তান হিন্দু শূন্য, বাংলাদেশও সেই পথেই এগিয়ে চলেছে।

সাতচল্লিশ ও একাত্তরের সংগঠিত গণহত্যার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর নির্বিচার নির্মম হত্যালীলা, লক্ষ লক্ষ হিন্দু নারীর উপর সংগঠিত গণধর্ষণ ও নারকীয় অত্যাচার, কোটি কোটি হিন্দু ভিটেচ্যুত হওয়ার পর হিন্দুরা পাল্টা প্রতিরোধে নেমে সন্ত্রাসবাদী হয়ে উঠেছে, ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট অ্যাকশনে নেমেছে, ট্রেন বাস জ্বালিয়ে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে রাস্তা অবরোধ করে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছে এমন নজির নেই।

কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ৫০০০ বছরেরও বেশি ইতিহাস আছে। কাশ্মীরের ক্ষমতায় তখন শেখ আব্দুল্লা-পুত্র ফারুক আব্দুল্লা। ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে ফারুক আব্দুল্লা কুখ্যাত ৭০ জন জঙ্গিকে কাশ্মীরের কারাগার থেকে নিঃশর্তে মুক্তি দেয়। তারপরেই কাশ্মীরে শুরু হলো এক নাগাড়ে হিন্দু নিধন। ১৯৯০ সালের ৪ জানুয়ারি হিজবুল মুজাহিদিন দেশের প্রশাসনকে বৃদ্ধাগুষ্ঠ দেখিয়ে গণমাধ্যমে রীতিমতো বিজ্ঞপ্তি জারি করে ঘোষণা করল, হিন্দুদের কাশ্মীর ছাড়তে হবে। জঙ্গি গোষ্ঠীগুলি পণ্ডিতদের বাড়ির দরজায় কাশ্মীর ছাড়ার নোটিশ ঝুলিয়ে দিল। স্লোগান উঠলো— 'কাশ্মীরে থাকতে গেলে আল্লা-হু- আকবর বলতেই হবে'। সেই সঙ্গে শুরু হলো নৃশংস হত্যালীলা। প্রায় চার লক্ষ কাশ্মীরি হিন্দু সেদিন চৌদ্দপুরুষের ভিটে ছেড়ে সর্বস্ব হারিয়ে উদ্বাস্তু হলো। সেদিনের নরহত্যার দলিলে উল্লেখ রয়েছে কিছু হৃদয় বিদারক ঘটনার কথা। বিচারপতি নীলকান্ত গাঞ্জুকে হত্যা করে তার দেহ রাস্তায় ফেলে রাখা হলো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর ছিন্নভিন্ন দেহ রাস্তায় পড়ে রইল। সাহস করে কেউ সেই মৃতদেহ সরাতে এগিয়ে এলো না। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সর্বানন্দ কাউল প্রেমী প্রতিদিন কপালে তিলক পরতেন। কপালের ঠিক যে জায়গায় তিনি তিলক পরতেন, সেই জায়গায় পেরেক ঠুকে ঠুকে তাঁকে নৃশংস ভাবে তিল তিল করে হত্যা করা হলো। বি. কে. গাঞ্জুকে নৃশংস ভাবে খুন করে তাঁর রক্ত দিয়ে মাখা-ভাত তাঁর স্ত্রীকে খেতে বাধ্য করানো হলো, তারপর তাঁকে এমন তীব্র গণধর্ষণ করা হলো, যে সেই ভয়াবহ ধর্ষণের তীব্র অত্যাচারেই তাঁর মৃত্যু ঘটল। নার্স শ্রীমতী সরলা ভাটকে প্রকাশ্য রাস্তায় গণধর্ষণ ও হত্যা করে তাঁর নগ্নদেহ রাস্তায় উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা হলো হিন্দুদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্য। স্কুল শিক্ষিকা গিরিজা টিক্কাকে নৃশংস ভাবে গণধর্ষণ ও খুন করা হলো। এ ছাড়াও হিন্দু পণ্ডিতদের জীবন্ত অবস্থায় লোহার শলাকা দিয়ে চোখ ফুঁড়ে দেওয়া হলো। মহিলাদের স্তন ও যৌনাঙ্গ ছিন্নভিন্ন করে প্রকাশ্য রাস্তায় প্রদর্শন, সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে যুবতীদের শরীরের গোপন অঙ্গ পুড়িয়ে দেওয়া, কেটে টুকরো করে চৌরাস্তায় সংযোগ স্থলে ঝুলিয়ে রাখার অজস্র ঘটনা ঘটলো। জীবন, মানসম্ভ্রম বাঁচাতে দলে দলে কাশ্মীরি পণ্ডিত সপরিবারে পালিয়ে এসেছিলেন দিল্লিতে। ইতিহাস বলছে তাঁরা কিন্তু একবারের জন্যও পালটা হাতে আইন বা অস্ত্র তুলে নিয়ে সন্ত্রাসবাদের পথে পা বাড়াননি কিংবা ট্রেন বাস জ্বালিয়ে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংস করে, রাস্তা অবরোধ করে জনজীবন বিপর্যস্ত করে তোলেনি।

হিন্দুদের অত্যাচারিত হওয়ার এই পরম্পরা শুধু বাংলাদেশ, পাকিস্তান আফগানিস্তানে নয়, হিন্দুবহুল ভারতের মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এখনো ঘটে চলেছে। যেমন মুর্শিদাবাদের হিন্দুরা বাংলাদেশের হিন্দুদের মতোই আতঙ্কে দিন যাপন করে। কিন্তু হিন্দুরা এর প্রতিবাদে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চালিয়েছে এমন নজির নেই। ইতিহাসের এই ধারা বলছে হিন্দুদের এই সহনশীলতার জন্যই ভারতের ঐক্য ও সংহতি, সেই সঙ্গে হিন্দুদের অস্তিত্ব ক্রমশই বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। সেজন্য নিজেদের রক্ষা, জেহাদি ইসলামের ভয়ংকর থাবা থেকে ভারতবর্ষকে রক্ষার জন্য এবার রুখে দাঁড়াতে হবে।

মানবতার ভেকধারী জেহাদি হায়নাদের প্রতিহত করতে হবে। ■

অন্ধকার থেকে আলোর দিশায় এগিয়ে চলেছে ভারত : অরুণ কুমার

গত ১৫ জানুয়ারি ভারত বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে সল্টলেকের ইজেডসিসি-র সভাকক্ষে 'বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে ভারতের রূপান্তর' শীর্ষক এক বৌদ্ধিক সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় প্রচার প্রমুখ তথা জম্মু-কাশ্মীর স্টাডি সেন্টারের সংযোজক শ্রীঅরুণ কুমার। ভাষণটির সংক্ষিপ্ত অংশ প্রকাশ করা হলো। — স্ব. স.

স্বামী বিবেকানন্দ নচিকেতা সম। তিনি ও তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণদেব সেই সময়ের দূত যখন ধর্মান্তরণের বিষাক্ত বাতাস ভারতের হিন্দু সমাজকে ক্ষত বিক্ষত করছিল। আপন শ্রদ্ধার বলে নচিকেতা যমরাজের কাছ থেকে ব্রহ্মজ্ঞান অর্জন করেন। নচিকেতার সেই সনাতনী সমাজ আজ নিজেকে নষ্ট করছে। কারণ তারা নিজেরদের শিকড়টাকে শ্রদ্ধা করতে ভুলে গেছে, নিজেদের ইতিহাস ভুলে গেছে। স্বামীজী বলেছেন, যে সমাজ আত্মবিস্মৃত হয় সে সমাজের অন্তিমক্ষণ দ্রুত ঘনিয়ে আসে। তিনি বিশ্বের দরবারে ভারতের তথা হিন্দুত্বের জয়গান গেয়েছিলেন। হিন্দু কী, ভারত কী? দুনিয়ার বাকি দেশ ও ভারত এক নয়। ভারত একটি রাষ্ট্র। রাষ্ট্র এক, রাজ্য অনেক। হিন্দুত্ব ও ভারত একে অপরের পরিপূরক। ভারত একটি জীবনযাত্রা। একটি সনাতনী যাত্রা। পশ্চিমের দেশগুলি ভারতকে বুঝবে না। গান্ধার হতে শ্রীলঙ্কা অখণ্ড ভারতের অংশ ছিল। এই অখণ্ড ভারতের উপর বার বার বৈদেশিক আক্রমণ হয়েছে। শক্, হুন, কুষান, এমনকী গ্রিক সকলে এসে এই একদেহে লীন হয়েছে। পারেনি কেবল মোগল-পাঠানরা। তারা এসে অকথ্য অত্যাচার করেছে। মন্দির ধ্বংস করেছে। আমাদের স্বাভিমানে হাত দিয়েছে। তবুও আজকের বিকৃত ঐতিহাসিকরা তাদেরই বন্দনা করেন। আত্মবিস্মৃতি ও পরানুকরণই এর কারণ। মুনিঋষিদের এই সুপ্রাচীন ভারত ছিল সোনার পাখি (সোনে কী চিড়িয়া)। মরুদস্যু, ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ যে যেখান থেকে পেরেছে সেই সোনার পাখির লোভে ভারতকে আক্রমণ করেছে। তার সঙ্গে অবশ্যই আক্রমণ হয়েছে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকার উপরও। এই সব প্রাচীন দেশ থেকে মানুষদের পশুর মতো ধরে এনে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করেছে। কিন্তু আমরা সুপ্রাচীন জাতি কেন ক্রীতদাস হয়ে থাকব? তাই বার বার আমরা বিদ্রোহ করেছি। নিজেদের অধিকারের জন্য লড়াই করেছি। কিন্তু আমেরিকার ইতিহাস ক'জন জানেন? মাত্র দু'শো-আড়াইশো বছরের ইতিহাসে সাদা চামড়ার মানুষ নিজেদের মধ্যে লড়াই করেছে। তার থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হয়েছে। ইতালির বয়স ১৫০ বছর। জার্মানির বয়সকালও তাই। ব্রিটিশদের প্রকৃত বয়স মাত্র হাজার বছর। যুদ্ধ, যন্ত্রণা, স্বার্থ থেকে এদের উত্থান। এরা কী জানে ভারতকে? এর সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, এর সংস্কৃতিকে?

ভারতীয় ভাবনায় এখানে সবাই ব্রহ্ম। প্রাচীন ভারতে বৈদিক মুনিঋষিরা তাই উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করতেন 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'— 'আমিই ব্রহ্ম' বা 'আমি দিব্য'। এখানে দেহ হলো খোলস, ভেতরে পরমাত্মা। সবার মধ্যে পরমাত্মা বাস করেন। জীবে প্রেম করে যে জন সে জন সেবিছে ঈশ্বর। এখানে কেউ ছোটো বা বড়ো নয়। সমাজ গড়ে উঠেছে কর্মের ভিত্তিতে। এখানে সবাই সবার মঙ্গল কামনা করেন। 'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ। সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখমাপ্নুয়াৎ।। ওম্ শান্তি শান্তি শান্তি।।'

অর্থাৎ সবাই যেন সুখী হয়, সকলে যেন নিরাময় হয়, সকল মানুষ পরম শান্তি লাভ করুক, কেউ যেন কখনও দুঃখ না করেন। সকলেই শান্তি লাভ করুন। আমরাই বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করে তাই বিশ্বের মঙ্গল কামনা করে বলতে পারি বসুধৈব কুটুম্বকম্—অর্থাৎ গোটা বিশ্ব আমার আত্মীয় অর্থাৎ বিশ্বের সঙ্গে আমার আত্মার সম্পর্ক। এটি ভারতবর্ষের সার্বিক মন্ত্র।

গুরুগৃহে আমরা শিক্ষা পাই যে, ত্যাগ ও সেবাই জীবনচর্যার সূত্র। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই রাষ্ট্রের চার পুরুষার্থ। 'ধর্মে চ অর্থে চ মোক্ষে চ ভারতর্ষভ। যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎক্কচিৎ।।' ভারতে রাজ্য অনেক, রাষ্ট্র এক। মানুষ এক। এক রাষ্ট্র, এক জাতি, এক সংস্কৃতি। আমি যখন নেপাল গেছিলাম তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, নেপাল-ভারত সম্পর্ক ভালো নয় কেন? আমি তখন বলেছিলাম, তিব্বত ও নেপাল যুদ্ধ করত। কিন্তু উভয়ের প্রজাদের সম্পর্ক ভালো ছিল। কারণ নেপাল ও তিব্বত কোনো না কোনো ভাবে সনাতনী ছিল। নেপাল হিন্দুরাষ্ট্র। হিন্দুত্ব সেখানকার শক্তি এবং অখণ্ড ভারতের অংশ। সেভাবে দেখলে ভারত তাই অদ্ভুত দেশ। ভারতের প্রাণ হলো ধর্ম। স্বামীজী বলেছেন— ঈশ্বর প্রদত্ত ধর্ম দ্বারা চালিত ভারতের লক্ষ্য বিশ্বের কল্যাণ করা। আমরা পৃথিবীতে উপনিবেশ বানাইনি। আমাদের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সারা পৃথিবীতে পৌঁছে দিয়েছি। খোটান থেকে কুচা, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া আমাদের সাংস্কৃতিক উপনিবেশ ছিল।

ব্রিটিশদের নিকট দীর্ঘ পরাধীনতার গ্লানি ভোগ করার পর বহু রক্তের বিনিময়ে ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা তো পেল কিন্তু দেশ ভাগ হলো। কেন? কীসের ভাগ? ভারত তো অখণ্ড। নতুন রাষ্ট্র নয়। রাষ্ট্র এক সাংস্কতিক ধারণা। তাহলে ইংরেজ ভাগ করবে কী? বহুত্ববাদ ভারতের সনাতন ঐতিহ্য। তাহলে তার দেহ কেটে কেটে বার বার নতুন রাষ্ট্র নির্মাণের চেষ্টা কেন? যারা আজাদির লড়াই চেয়ে ভারতের ভাগ চায় তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী অশুভ শক্তি। তারা সন্ত্রাসী। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী ভারত এক। তাহলে কেন ৩৭০ ধারা লাগু করে অখণ্ডতার অপমান করা হলো? আমরা সবাই এক ভারতের। কোনো এক ধর্ম, ভাষা, প্রাদেশিকতা কারুর কারুর পরিচয় নয়। ১৯৫২ সালে সেই স্বাভিমানে আবার আঘাত লাগল জম্মু-কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা চালু করে। মুসলমান অধ্যুষিত জম্মু-কাশ্মীর সাংবিধানিক গ্যারান্টি চাইল। যদিও কাশ্মীরে আগে কোনোদিনও মুসলমান সংখ্যাধিক্য ছিল না। সে এক বৃহৎ ইতিহাস। ১৯৪৭এ যখন বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পাকিস্তান পেয়ে গেল, তারপরেও কাশ্মীরে আলাদা সংবিধান কেন? ড. শ্যামাপ্রসাদ প্রতিবাদ করলেন। প্রতিবাদের মূল্য চুকিয়েছেন তিনি জীবন দিয়ে। ১৪ মে ১৯৫৪ সালে ৩৫-এ লাগু হলো। দেশের মানুষকে আবার দু'ভাগ করা হলো। এক, ভারতের এক দল মানুষ জম্মু কাশ্মীরের। দুই, ভারতের বাকি মানুষ জম্মু-কাশ্মীরের নয়। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এল, ভারতের পতাকা উড়ল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে কিন্তু ধর্মপ্রচার করতে আসেনি। পরে এসেছে। সেই মিশনারিদের নোংরা ইতিহাস অনেক বড়ো। ভারতের এমন ম্লেচ্ছরাই ইতিহাসকে নষ্ট করেছে। তাই ভারতের ইতিহাসের নায়ক ম্লেচ্ছ আক্রমণকারীরা হতে পারে না।

বহু বছর ধরে এভাবেই ভারতের মানুষকে নানা ভাবে ভাগ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু এখন নতুন ভারতের রূপান্তর ঘটছে। মুসলমান মহিলাদের অবমাননাকর তিন তালাক প্রথা রদ হয়েছে। গত ১০ নভেম্বর ২০১৯ শ্রীরামজন্মভূমির পক্ষে সর্বোচ্চ আদালতের রায় এসেছে। সেকুলাররা বলল কী দরকার এসবে? একদল বলল ওখানে ভারতের প্রথম মসজিদ ছিল। ইতিহাস সাক্ষী— ওখানে কখনো মসজিদ ছিল না। ভারতের পরিচয় রাম, কোনো বিদেশি অত্যাচারী সুলতানের সেনাপতি দ্বারা তৈরি বাবরি মসজিদ নয়। ঈশ্বর এক। তাঁকে যেমনভাবে খুশি ডাক। কিন্তু মন্দির নষ্ট করে মসজিদ? নাঃ, বহু হয়েছে। জমি রামলালার। তাই বাবরি ধাঁচা ধ্বংস হলো। ১৫ কোটি মানুষ রামজন্মভূমি উদ্ধার আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। সারা দেশে শিলাপূজা হলো। এভাবেই রাম জন্মভূমির পক্ষে রাস্তা প্রশস্ত হলো।

গত ডিসেম্বরে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (CAB) পাশ হয়ে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের পর নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (CAA) চালু হলো। সেইসব হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পারসিকরা ভারতে থাকতে পারবেন, যারা আফগানিস্থান, বাংলাদেশ, পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে এসেছেন। কিন্তু মুসলমানদের হয়ে কয়েকজন স্বার্থপর লোক বলল, তাদের তাড়ানোর জন্য এসব করা হয়েছে। দেশ স্বাধীনতার সময় পাকিস্তান যারা চাইত, যারা ভাগ করেছে দেশ এখন আবার তারাই পাকিস্তান নামক দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতা এবং নিজেদের নোংরা ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য এখানে এসে দলে দলে জুটতে লাগলো। এর জন্যই দরকার হয়েছে ভারতের নাগরিকত্ব আইন। সেই সময় একথা বলা হয়েছিল যে, ভারতে যেদিন থেকে সংবিধান রচিত হয়েছে এবং সংবিধান কার্যকরী হয়েছে সেইদিন থেকে সাধারণ মানুষ ভারতের নাগরিক বলে পরিগণিত হবেন। তবে এর ভবিষ্যৎ কী হবে বা পরবর্তীকালে কীভাবে নাগরিকত্ব তালিকা তৈরি করা হবে তা একমাত্র ভবিষ্যতের অবস্থার উপর নির্ভর করবে। ১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারিতে সংবিধান রচিত হলো এবং ১৯৫০ সালের ৫ নভেম্বর The immigrants (Expulsion from Assam) ACT -এর খসড়া বাবাসাহেব আম্বেদকর প্রস্তুত করলেন। সংবিধান প্রস্তাবনার ১০ মাস পর এটা শুরু হলো। নেহরু বললেন, ''যারা পাকিস্তান থেকে অত্যাচারিত হয়ে এসেছে তারা আমাদের ভাই। তাদের এখানে আশ্রয় দেওয়া আমাদের কর্তব্য। বাকিদের তাড়ানো হবে।''

এরপর ১৯৬৪ থেকে ১৯৭২ সাল। বিশ্ব জুড়ে দেখল পূর্ব পাকিস্তানে ভয়ংকর হিন্দু নরসংহার। ১ কোটি লোক প্রাণ ও মান বাঁচাতে পালিয়ে এল ভারতে। ৩০ লক্ষ হিন্দুকে হত্যা করা হলো। ইন্দিরা গান্ধী বললেন, অত্যাচারিত এই হিন্দুদের ভারতে থাকতে দেবেন। কী হলো তার? এক সময় কংগ্রেসের মনমোহন সিংহ থেকে বামপন্থী

নেতা প্রকাশ কারাট পর্যন্ত উদ্বাস্তুদের নাগরিকত্ব প্রদানের দাবিতে রাষ্ট্রপতির নিকট অবধি গেছিলেন। আজ কেন তাঁদের এমন উলটো সুর? পাকিস্তান হলো। আমরা কিন্তু জনবিনিময়ের কথা বললাম না। গান্ধীজী জিন্নাকে বিশ্বাস করতে বারণ করলেন। দেশভাগের সময় মানুষ ভাবতেও পারেনি কী হবে। একদিকের মানুষ এক রাতে ভারতীয় থেকে পাকিস্তানি হয়ে গেল। ওরা তো মন থেকে ভারতীয় ছিল, আছে, থাকবে। চার যুগ কেটে গেছে, তারা স্বাধীন হয়ে আবার পরাধীন হলো। তাদের ধর্ম, আস্থা সব নষ্ট হলো। লিয়াকত-নেহরু চুক্তি হলো। শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুদের জন্য ভূভাগ চাইলেন, সম্পত্তির দাম চাইলেন, প্রতিবাদ করলেন। অতপর তিনি পদত্যাগ করলেন। সর্দার প্যাটেল প্রতিবাদ করলেন। কেউ শুনলেন না। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আইন মন্ত্রী যোগেন মণ্ডল পালিয়ে এসে নিজের ভুল স্বীকার করলেন।

সব ধর্ম, সব জাতির মানুষের ইসলামি দেশে অধিকার নেই। সেখানে সেকুলার শব্দটি অচল। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান আইনি ভাবে ইসলামিক দেশ হলো। ১৯৭১ সালে ৩০ থেকে ৫০ লক্ষ হিন্দুর অত্যাচারের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশও ইসলামিক হলো। এখন অত্যাচারিত হিন্দুরা ভাবছেন তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে যেন এমন না হয়। তাই তারা ভারতে আসছেন বাঁচার তাগিদে। তাঁদের গ্রহণ করা আমাদের কর্তব্য। আমরা গঙ্গাজল হাতে নিয়ে বলি আমরা অখণ্ড ভারতের অধিবাসী। আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে থাকা অত্যাচারিত লোকগুলোর আইডেন্টিটি বদলে গিয়েছে। কেন? প্রশ্ন করুন নেতাদের।

দুদিন আগে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী পি চিদাম্বরম বললেন, চার দিনের মধ্যে নাকি নাগরিকত্ব বিল এসেছে। কিন্তু সংসদে তো এ আলোচনা দীর্ঘ দিনের। ২০১৬ তে প্রথম এই অ্যাক্ট নিয়ে আসার প্রস্তাব রাখা হয়। ৯ হাজার সংশোধনী হয়। ২০১৮-তেও বিল পাশ হয়নি। অবশেষে ২০১৯-এ তা হলো। এটি মানবিক বিষয়। গত ৭০ বছর ধরে নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী ও মনমোহন সিংহ-সহ

নানা দল নাগরিকত্ব নিয়ে যা বলেছেন সেগুলো তবে কি ভুল?

১৯৭৬-এ সংবিধানে সেকুলার শব্দ এল। কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরে তা লাগু হলো না। সাহস হলো না সরকারের। গুলাম নবি আজাদ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। সেখানে হিন্দুদের কোনো অধিকার দেওয়া হলো না। সেকুলারিজম ইসলাম-বিরোধী তাই? অবশেষে ৫ আগস্ট ২০১৯ তা লাগু হলো। এর আগে কোনো দল কেন করার সাহস দেখায়নি? আন্তর্জাতিক নানা কাগজ বলল ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাবার প্রক্রিয়া। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন নাকি সেকুলারিজমের বিরোধী? রাশিয়া ভাগ হলো। খ্রিস্টান ও ইহুদিরা মাইনরিটি হলো। নানা ছোট ছোটা দেশে তারা ছড়িয়ে পড়ল। তাদর কেউ রাশিয়া গেল, কেউ আমেরিকায় গেল। সেখানে মাইনরিটি বিল পাশ হলো। ১৯৮৯ সালে তা হলো। ইরানের সখ্যালঘুদের জন্য আমেরিকা বিল আনতে পারে, কিন্তু আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের জন্য নয়। ভারত তা করলে কটাক্ষ করে। ভাবুন একবার, কংগ্রেস এক দেশের জন্য ভোটে লড়লেও কিন্তু জেতার পর বেইমানি করল।

কেউ ভাবল দেশ ভাগ হলে অন্য অংশের মানুষের কী হবে? এভাবে চললে তো দেশ টুকরো হবে। দেশভাগে ১০ লাখ মানুষের প্রাণ গিয়েছে। ১.৫ কোটি হারিয়ে গিয়েছে। এসব চিন্তা করার সময় এসেছে। নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতার নামে যে সন্ত্রাসী শক্তি এখন দেশে অশান্তির সৃষ্টি করছে তারা কারা? তাদের বুঝুন। ছাত্র আন্দোলনের পিছনে কারা? পিএফআই, আইসিস-রা আবার ভারতকে ভাগ করতে চায়। গত ৬ বছর লিনচিং, ইন্টলারেন্সের কাজ এরাই করেছে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য। বিরোধীরা যদি নাগরিকত্ব আইন সবার জন্য চান তাহলে দেশবিভাগ সমাপ্ত করে দেওয়ার আওয়াজ তুলুন। তাহলে এসব কিছুই থাকবে না। দুনিয়ার সব দেশে NRC আছে। নিজের মতো করে আছে। ১৯৫০-এ নেহরু প্রথম বিষয়টি আনেন। সব দেশের একটি নাগরিক তালিকা আছে। ভারতের কেন থাকবে না? আমাদের ঐতিহ্য আছে। ইতিহাস আছে। ভারত সেপথে অগ্রণী হয়েছে। সন্ত্রাসীদের সামনে আমরা ঝুকব না। আমাদের একদেশ, এক সংস্কৃতি। সবাই এক সঙ্গে সম্মানের সঙ্গে বাঁচবো। আমরা দেশের নাগরিকদেরও এরটি তালিকা (NRC) চাই। ভারত জাগছে। নিজেকে জানছে। শক্ত ভারত, সমর্থ ভারতের দিকে এগিয়ে চলেছে। পুরনো ভারত এখন নতুন হয়ে উঠছে। ■

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে জামিন পেলেন অর্চনা

ধর্মানন্দ দেব

প্রথমেই বলে রাখা ভালো কর্ণাটক এমন একটি রাজ্য যেখানে বাংলাভাষা হচ্ছে দ্বিতীয় অফিসিয়েল ল্যাঙ্গুয়েজ, যদিও মাত্র ০.০৩ শতাংশ লোক বাঙ্গালি। কর্ণাটক রাজ্য যখন গঠন হয় অর্থাৎ ১৯৫৬ সালের ১ নভেম্বর তখন রাজ্যটির নাম ছিল মহীশূর এবং পরে ১৯৭৩ সালে রাজ্যটির নাম হয় কর্ণাটক। রাজ্যটির রাজধানী ব্যাঙ্গালুরু এবং ওই রাজধানীতেই অবস্থিত কর্ণাটক হাইকোর্ট। এই কর্ণাটক হাইকোর্ট সমগ্র দেশের মধ্যে প্রথম ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের আওতায় জামিন মঞ্জুর করে অর্চনা পূর্ণিমা প্রামাণিককে। তার পূর্বপুরুষেরা ছিলেন হিন্দু বাঙ্গালি। বর্তমানে তার বয়স হবে আনুমানিক ৩৭ বছর। তার বাল্যকাল কাটে বাংলাদেশের রাজশাহি এলাকায়। বাবার নাম অনিল চন্দ্র প্রামাণিক। অর্চনা ১৯৯৪ সালের ১৬ জুলাই বাংলাদেশের অ্যাডভেন্টিস্ট সেমিনারি অ্যান্ড কলেজ চার্চ থেকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন। সেখানে খ্রিস্টধর্ম নেওয়ার পরেও রেহাই হয়নি। শুরু হয় পার্শ্ববর্তী এলাকার যুবকদের অত্যাচার, নির্যাতন ও অপহরণের হুমকি। শেষপর্যন্ত বাংলাদেশ পুলিশের দ্বারস্থ হন অর্চনা। কিন্তু নির্যাতনের মাত্রা কমেনি। অন্যদিকে অর্চনার মনে 'নার্স' হওয়ার স্বপ্ন। তাই অর্চনার বাবা তাকে ভারতে পাঠিয়ে দেন নার্সিং কোর্স পড়ার জন্য। ২০০৩ সালে রাঁচির Seventh day Adventist Hospital-এ ভর্তি হন অর্চনা এবং ২০০৬ সালে ওই হাসপাতাল থেকে General Nursing and Midwifery-র ডিপ্লোমা পান।

তারপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন নামিদামি হাসপাতালে অর্চনা নার্স হিসেবে কাজ করেন, যেমন— Wockhardt Hospital and Kidney Institute (Fortis Hospital), Manipal Hospital, Vikram Hospital, Cloud Nine Hospital। সেইসময় তার সাক্ষাৎ হয় কর্ণাটকের কোনো

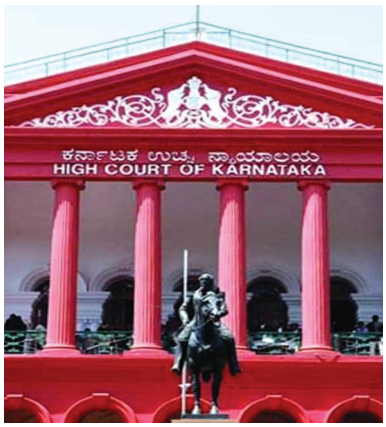

২০১৯ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে হওয়া সবকটি মামলা সুপ্রিমকোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে বা পাঁচ বা তার অধিক বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটি যাওয়ার সম্ভাবনাই রয়েছে। আর তখন যদি সুপ্রিমকোর্ট সিএএ-র বিরুদ্ধে সবকটি মামলা খারিজ করে দেয়, তাহলে দেশ জুড়ে আন্দোলনকারীদের মুখ রক্ষার কোনো পথ থাকবে না।

রাজশেখরণ কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে এবং ১২ মার্চ ২০১০ ওই কৃষ্ণমূর্তির সঙ্গে অর্চনার রেজিস্টার্ড ম্যারেজ হয় রাঁচি শহরে। বিয়ের পর উভয়ই চলে যান ব্যাঙ্গালুরু। আর সেখানেই অর্চনা পান ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড, আধার কার্ড ও পাসপোর্ট। কিন্তু আবার বিড়ম্বনা দেখা দেয় ২০১৯ সালের ২০ মে। বাংলাদেশ যাওয়ার জন্য কলকাতা আসেন অর্চনা ও তার চার বছরের পুত্র। সেইসময় কলকাতা ইমিগ্রেসন অফিসার তাদের আটক করে। কিছু সময় পর কলকাতা ইমিগ্রেসন অফিস থেকে তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পরে পাসপোর্ট অফিস থেকে তাদের পাসপোর্ট প্রত্যাহারের নোটিস আসে।

২০১৯ সালের ২১ আগস্টে ব্যাঙ্গালুরুর আর. টি. নগর থানায় অর্চনার বিরুদ্ধে একটি মামলা দাখিল করে সহকারী অফিসার। ওই মামলাটি ২০১৯ সালের ৫ নভেম্বর রেজিস্টার্ড হয়। মামলার নম্বর ২৬৩/২০১৯ এবং নথিভুক্ত হয়েছিল ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনের ৫,১২,১৪ নম্বর ধারায়, ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৩ (১) (সি) ধারায় এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬৫/৪৬৮/৪৭১ ধারায়। অভিযোগ ছিল উপরে উল্লেখিত আধার কার্ড, প্যান কার্ড প্রতারণা করার জন্য জাল করে তৈরি করা হয়েছিল। ওই জাল নথি দিয়ে পাসপোর্ট পান। জাল নথির উপর ভিত্তি করেই অর্চনা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে যাচ্ছেন। ওই মামলার সূত্র ধরেই ২০১৯ সালের ৭ নভেম্বর সকালে অর্চনার ব্যাঙ্গলুরু আর টি নগর মন্দির রোডের বাড়িতে এসে হাজির হয় আর টি নগর থানার পুলিশ এবং সকাল প্রায় ৭-৩০ মিনিটের সময় গ্রেপ্তার করে অর্চনা পূর্ণিমা প্রামাণিককে। নিম্ন আদালত জামিন নাকচ করে চারদিনের রিমান্ডে নেয়। অর্চনা আবার জামিন আবেদন করে সেসন জজ আদালতে। সেখানেও জামিন আবেদন নাকচ হয় গত ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে। জামিন আবেদন নম্বর ছিল— CRL, MISC, 10545/2019। পরে অর্চনা দ্বারস্থ হন কর্ণাটক হাইকোর্টের।

কর্ণাটক হাইকোর্ট ২০২০ সালের ২৭ জানুয়ারি শর্তসাপেক্ষে অর্চনা পূর্ণিমা

প্রামাণিকের জামিন মঞ্জুর করে। ওই নির্দেশে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের নতুন সংশোধনীর ২ নম্বর ধারা মতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ সাল পর্যন্ত ধর্মীয় নির্যাতনের শিকার হয়ে হিন্দু, জৈন, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, পারসি ও শিখ ধর্মাবলম্বী মানুষ অর্থাৎ বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সংখ্যালঘু মানুষ নিজ দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছেন তাদের ক্ষেত্রে পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ) আইন ১৯২০ এবং ১৯৪৬ সালের বিদেশি আইনে রেহাই দেওয়া হয়েছে বা প্রযোজ্য হবে না বলা হয়েছে। মানবিক কারণেই তাদের ভারতে থাকতে দেওয়া হবে প্রয়োজনীয় বৈধ নথিপত্র ছাড়াই। এইসব ধর্মাবলম্বী মানুষ ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের অধীনে 'অবৈধ অনুপ্রবেশকারী' নন। তাই এই ধারার যে সুফল পান অর্চনা সেক্ষেত্রে কর্ণাটক রাজ্য সরকারের আইনজীবীর কোনো আপত্তি নেই বলে জানান। জামিনের নির্দেশের ৬ নম্বর প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট বলা হয়েছে—

The records produced by learned HCGP indicate that investigation is still in progress. He does not dispute the fact that the petitioner is entitled to the benefit of amended section 2 of Citizenship Act, 1955.

অর্চনার আইনজীবী শ্রীমতী আয়ন্তিকা মণ্ডল ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের নতুন সংশোধনীর ২ নম্বর ধারার পক্ষে সাওয়াল করতে গিয়ে আদালতকে অত্যন্ত সুন্দর যুক্তি তুলে বলেন— নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন মতে মামলা থেকে একজন রেহাই পাবেন তখনই যখন তিনি দেশীয়করণ বা রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাবেন। কিন্তু সেটা পাওয়ার জন্য কেন্দ্র সরকার এখনো কোনো রুলস তৈরি করেনি। তবে এই অনলাইন নাগরিকত্ব পেতে হলে অর্চনা পূর্ণিমা প্রামাণিকের সশরীরে উপস্থিতির প্রয়োজন রয়েছে। সেই উপস্থিতির জন্য এবং নতুন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের সুফল পাওয়ার জন্য তাকে জামিনে মঞ্জুর করার আবদার জানান। কর্ণাটক হাইকোর্টের বিচারপতি জন মাইকেল সরকার পক্ষ ও অর্চনার আইনজীবীর সওয়াল জবাব শুনে শর্ত সাপেক্ষে দু' লক্ষ টাকার বন্ড ও দু'জন জামিনদার সহযোগে জামিন মঞ্জুর করেন। শর্তগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে প্রতি মাসের দু'দিন (প্রথম/পঞ্চদশ দিনে) তদন্তকারী পুলিশ অফিসারের কাছে হাজির হওয়ার নির্দেশ।

উল্লেখ্য, ইতিমধ্যে কংগ্রেস ও বেশিরভাগ বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং তাদের মদতপুষ্ট সংগঠন ও ব্যক্তিরা সুপ্রিমকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন ২০১৯ সালের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধাচরণ করে। হাতে থাকা তথ্য বলছে এখন অবধি নয়া নাগরিকত্ব আইনকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সর্বমোট পিটিশন দাখিল হয়েছে ১৪৪টিরও বেশি। তার মধ্যে রয়েছে অসম প্রদেশ কংগ্রেস (রিট পিটিশন নম্বর ১৫১১/২০১৯), সিপিআই (রিট পিটিশন নম্বর ০২/২০২০), দেবব্রত শইকিয়া (রিট পিটিশন নম্বর ১৪৮২/২০১৯), অজন্তা নেওগ (রিট পিটিশন নম্বর ১৪৮৪/২০১৯), জয়রাম রমেশ (রিট পিটিশন নম্বর ১৪৭৩/২০১৯), আসাদুদ্দিন ওবেসি (রিট পিটিশন নম্বর ১৪৮৫/২০১৯), প্রদ্যুত দেববর্মণ (রিট পিটিশন নম্বর ১৫১১/২০১৯), হর্ষ মান্দার (রিট পিটিশন নম্বর ১৫০০/২০১৯), মুসলিম অ্যাডভোকেটস অ্যাসোসিয়েশন (রিট পিটিশন নম্বর ১৫০৩/২০১৯), মহুয়া মৈত্র (রিট পিটিশন নম্বর ১৪৬৬/২০১৯), সৈয়দ ফারুক, জমিয়ত উলেমা হিন্দ, কেরল জমিয়ত উলেমা হিন্দ, অসম জমিয়ত উলেমা হিন্দ, ইন্তিকাব আলম, আবু সুয়েল, মতিয়ুর রহমান, পিস পার্টি, লোকতান্ত্রিক যুব জনতা দল, ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লিগ (রিট পিটিশন নম্বর ১৪৭০/২০১৯)-এর মতো দল ও ব্যক্তিরাও।

ওই মামলাগুলির প্রথম শুনানি হয় বিগত ২২ জানুয়ারি এবং ওইদিনের কোর্টরুমের কথাবার্তা শুনে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে মামলাগুলি চলে যেতে পারে সুপ্রিমকোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে। এছাড়াও ইতিমধ্যে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৬ (ক) ধারা নিয়ে সুপ্রিমকোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে বিচারাধীন। এমনকী কেন্দ্র সরকারের জারি করা দুটি নোটিফিকেশন যা ২০১৯ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের মূল ভিত্তি— এই দুই নোটিফিকেশন নিয়েও অনেক আগে সুপ্রিমকোর্টে মামলা হয়েছে এবং এটি সাংবিধানিক বেঞ্চে বিচারাধীন। তাই বর্তমান ২০১৯ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে হওয়া সবকটি মামলা সুপ্রিমকোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে বা পাঁচ বা তার অধিক বিচারপতির বেঞ্চে মামলাটি যাওয়ার সম্ভাবনাই রয়েছে। আর তখন যদি সুপ্রিমকোর্ট সিএএ-র বিরুদ্ধে সবকটি মামলা খারিজ করে দেয়, তাহলে দেশ জুড়ে আন্দোলনকারীদের মুখ রক্ষার কোনো পথ থাকবে না। রাফাল-চুক্তিতে দুর্নীতির অভিযোগ রাহুল গান্ধী যখন নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানাচ্ছিলেন, তখন সুপ্রিমকোর্টের উল্টো রায়ে রাহুল গান্ধী ভর্ৎসিত হয়েছিলেন তা মনে আছে কি বর্তমান আন্দোলনকারীদের? পরিশেষে অবরোধ-বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে বলব, যেহেতু সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন প্রধান ধর্মাধিকরণের কাছে বিচারাধীন, তাহলে কেন সেই ন্যায় বিচারের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে না? অন্যদিকে এই মুহূর্তে সুপ্রিমকোর্ট যেহেতু নাগরিকত্ব আইনের উপর কোনো স্থগিতাদেশ জারি করেনি, মামলাটি আগামীদিনে সাংবিধানিক বেঞ্চে যাবে কিনা সিদ্ধান্ত হতে পারে আগামী শুনানিতে। তাই বর্তমানে ২০১৯ সালের সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র প্রদানে কোনো বাধা নেই। যেমন ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৬ (ক) ধারা সুপ্রিমকোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চে বিচারাধীন তবুও ওই ধারার উপর ভিত্তি করেই অসমে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী নবায়ন হয়েছে এবং একইভাবে কর্ণাটক হাইকোর্টের এই মামলাটিও একটি উদাহরণ হিসেবে নিতে পারি। তাই বন্ধ হোক 'ক্যা' নিয়ে এখন ক্যাউ ক্যাউ। ▮

বাংলা সিরিয়ালের ব্যাধি ঢুকেছে সংসার জীবনে

রাজু সরখেল

বাংলা সিরিয়ালে নারীর ভূমিকাকে দজ্জাল ও হিংসুটে দেখানো হয় কেন? এই প্রশ্ন এখন সকলের। আমরা জানি আমাদের জীবনে 'মা' শব্দের অর্থ মায়া, মমতা, স্নেহ, শীতল, ধৈর্য, সহিষ্ণু, আঁচল, রক্ষাকবচ, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, চণ্ডী, নির্ভীক, আশ্রয়দাত্রী এইরকম অনেক সমার্থক শব্দ আছে, যা লিখলে শেষ হবে না। যিনি সন্তানের জন্ম দিয়ে কর্তব্য শেষ করেন না। সন্তানকে শিক্ষাদীক্ষায় আসল মান হুশ করে না তোলা পর্যন্ত মায়েদের কর্তব্য থেকে বিশ্রাম নেই! পাশাপাশি পিতার ভূমিকাও সমান। তিনি সংসার চালাতে অর্থ আয়ে ব্যস্ত বলে মায়ের মতো অত সময় দিতে পারেন না বলেই আজ পিতার ভূমিকা নিয়ে কোনো গল্প লেখা হয় না। তবে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা বলতে মায়ের নাম প্রথমেই উঠে আসে, এটাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

সন্তানকে জন্ম দেওয়া থেকে বড়ো করা, তারপর বিয়ে দিয়ে মা থেকে শাশুড়ি হওয়া প্রতিটি নারীর স্বপ্ন। দেখা যায়, কিছু ক্ষেত্রে বউমার উপরে ছড়ি ঘোরাতে গিয়ে অধিকাংশই বাড়িতে অশান্তির ছায়া নেমে আসে। অবশ্য সব শাশুড়ি সমান হন না। এরকম অশান্তির ঘটনা দেশের অধিকাংশ বাড়িতেই আকছার ঘটছে। এদিকে ছেলের বউ হওয়া চাই শিক্ষিত, ফুটফুটে সুন্দরী, বাপের একই মেয়ে, আবার বেয়ান বেয়ানি হবেন সাবেকি, খুব আধুনিকতা ছাপ থাকবে এটাও নয় ইত্যাদি চাহিদা। প্রত্যাশা মতো সব আশা পূর্ণ হবার পরেও কিছু অনিচ্ছাকৃত কারণে যখন বনিবনা তলানিতে গিয়ে ঠেকে তখন দোষের সমস্ত দায়ভার বর্তায় গিয়ে ছেলের ঘাড়ে। সংসারে অশান্তি, মা বউমার মুখ দেখাদেখি বন্ধ। ছেলের মাথায় বজ্রাঘাত, কী করবে সে? দেখা যায়, মাকে ডাকলে বউ রেগে আগুন, বউকে ডাকলে মা রেগে আগুন। বাবা নীরব দর্শকের ভূমিকায়, কারণ তিনি দুজনের ইগো বুঝে যান। তাঁর কাছে দুজনেই সমান। আজকাল সমাজে এটাই চলছে। এই হলো সংসার আলাদা হবার কারণ। একমাত্র মেয়ে বাবা-মায়ের আদরের দুলালি কি এত কথা সহ্য করবে। হয় ডিভোর্স দাও, নয় তো সংসার আলাদা কর। এর মাঝে দ্বিতীয় পুত্র বা কন্যা থাকলে তাঁরা ফয়দা নেন। এঁরা মায়ের পাশে দাঁড়াবেন এটাই স্বাভাবিক। কারণ, মা যে তাঁদের লালন পালন করে বড়ো করেছেন। ঝড়, জল, বজ্র, বৃষ্টি, নানান আঘাত, প্রতিটি প্রতিকূলতা থেকে আগলে রেখে মা সন্তানদের রক্ষা করেন। সেই বিচারের নিরিখে মা যে শ্রেষ্ঠ তা বলতে কোনো দ্বিধা নেই। কিন্তু বউদি তো কোনো ঘরের কন্যা। তাঁর মা তাকে একইভাবে বড়ো করেছেন। তাহলে ওই মেয়েটি বউমা হয়ে পরের বাড়িতে বিয়ের পর এত লাঞ্ছিত হন কেন? কেন তাঁকে মেয়ের মতো দেখা হয় না? তাহলে বুঝতে হবে যেহেতু মা তাঁর তিলতিল করে গড়ে তোলা সংসার চট করে বউমার হাতে তুলে দিতে কষ্ট পান। যদি অধিকার কেড়ে নেয়? যদি তাঁকে আর কেউ পাত্তা না দেয় এই দুশ্চিন্তায় তিনি নিজের ক্ষমতা ছাড়তে চান না। এদিকে বউমাকে শাশুড়ির মন পেতে শাশুড়ির মতো সংসারের সমস্ত দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেন। ঘরদোর আঙ্গিনা পরিষ্কার করা থেকে কাপড় কাঁচা, বাসন মাজা, এমনকী রান্না সমস্ত কিছু করে বিকেলে স্নান সেরে ঠাকুরের পুজোপাঠ করে সকলকে খেতে দিয়ে তারপর বউমা যা পড়ে থাকে তা খান। তাহলেই শান্তি বিরাজ সম্ভব এই ধারণা বউমার মনে হয়। এর মধ্যে পান থেকে চুন খসলে বউমার তো নিস্তার নেই! তাঁকে মা যে কিছু শেখাননি এই কথাও শুনতে হয়। একে সদ্য বিয়ে আসা অন্য ঘরের মেয়ে, সবই অজানা, শ্বশুরবাড়ির হাল হকিকত বুঝতেই বছর গড়াবে, সংসারের ভালো-মন্দ, চাওয়া-পাওয়া, তাঁদের আশা-প্রত্যাশা কার কী রকম ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায় বেশিরভাগ বাড়িতে নতুন বউকে বোঝার সময়ই দেয় না। ফলে সুন্দর ফুটফুটে নতুন বউটির জীবনে নেমে আসে অন্ধকার। গরিব পরিবারের মেয়ে হলে আত্মহত্যা আর মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়ে হলে ডির্ভোস। শহর ও গ্রাম বলে কোনো ফারাক নেই। হিন্দু মুসলমান উভয় ক্ষেত্রেই একই।

মহিলারা সব সমাজের মধ্যে নির্যাতিত, লাঞ্ছিত, অপমানিত। আদালতে এরকম কেসের সংখ্যা ভুরিভুরি। সুরাহা সুদূরপ্রসারি। মামলা লড়তে লড়তে মক্কেলের অবস্থা শেষ। মেয়ে পক্ষের ভরণপোষণের দাবি। মুসলমান মহিলাদের অবস্থা তো আরও সঙ্গিন। বিশেষ করে গরিব ঘরের মেয়েদের তালাকের ঘটনা শুনলে চোখে জল আসবেই। একে তো কমবয়সে বিবি, ওই বয়সে তিন চার সন্তানের আম্মী, ওই অবস্থায় তালাক। আদালতের শরণাপন্ন যাতে তাঁকে বিবির স্থান দেওয়া হয়। কী নিদারুণ পরিহাস? সংসারের ইতিবৃত্ত নিয়ে অনেক গল্প লেখা হয়েছে, নামকরা লেখকের গল্পকে অবলম্বন করে নানা সিরিয়াল, সিনেমা, টেলিফিল্ম তৈরি হয়েছে। এখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মা, ননদ, কাকিমার দজ্জাল ও হিংসুটের চরিত্র রেখে সিনেমা ও সিরিয়ালকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করে পরিচালক। এভাবে বাস্তব জীবনের সংসারে অশান্তির বাতাবরণ তৈরি হয়। পরিবারের সদস্যদের মন বিষাক্ত হয়ে যায়।

মা হওয়া যেমন মুখের কথা নয়, ঠিক তেমনি আদর্শ শাশুড়ি হওয়াও মুখের কথা নয়। আজকাল বাংলা ধারাবাহিকে মা, বউমা, ননদ, পিসিমা, দিদিমার চরিত্রে কাউকে না কাউকে দজ্জাল, হিংসুটে দেখানো হয়। তাই, সংসারে ও সমাজে নেমে আসে ধারাবাহিকের (দজ্জাল ও হিংসুটেপনা) ব্যাধি। সেই সূত্র ধরে চলে মা বউমার দ্বন্দ্ব। পরিচালকরা যদি আজগুলি সিরিয়ালের পরিবর্তে মা বউমাদের মধুর সম্পর্ক সংবলিত সিরিয়াল ও চলচ্চিত্র উপস্থাপন করেন, তা সার্বিকভাবে সমাজকে সুস্থতার পথে নিয়ে যাবে। ■

স্বনামধন্য ডাক্তারবাবু সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বস্তিকার গত ১৩ জানুয়ারি সংখ্যাটি হাতে পেয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ২২ পাতায় এসে থেমে গেলুম! এখানে সেই গভীর দুঃখের খবর : 'পরলোকে ডাঃ সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়'! শিরোনামটি পড়েই মন গভীর বেদনায় ভরে গেল। দীর্ঘদিন হাওড়ার শিবপুর অঞ্চলে একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি। সেই সুবাদে এই এলাকা এবং শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানার ও বোঝার সুযোগ হয়েছে। তাই স্বনামধন্য 'ডাক্তারবাবু' সম্বন্ধে দু-চার কথা লিখছি।

প্রথমেই বলি, শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এমন অমায়িক, সেই সঙ্গে অশেষ গুণসম্পন্ন মানুষ দেখা যায় না! নিজের বৃত্তিতে একজন অসাধারণ পারদর্শী, সেই সঙ্গে খেলাধুলা ও সংগীত বিদ্যায় অভাবনীয় দক্ষতা! দু-চাকা গাড়িতে চেপে হাস্যবদনে রোগী দেখতে যাওয়ার দৃশ্য আজও চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একসময় শ্রদ্ধেয় 'ডাক্তারবাবু' আমি শিবপুরের যে স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলুম, তার পরিচালক সমিতির সভাপতি হয়ে সেবার যে পরিচয় রেখেছিলেন, সেকথা আজও স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করেন।

এবার একটি অন্য প্রসঙ্গে যাই। এক সময়ে আমাদের জীবনে দেশ শাসনের নামে নেমে এসেছিল 'জরুরি অবস্থা।' সঙ্গে সঙ্গে দেশহিতৈষী প্রতিষ্ঠানের কর্মী, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ওপর চলল নানা ধরনের নিপীড়ন। শ্রদ্ধেয় 'ডাক্তারবাবু' বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে ছিলেন এমন একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। তাই তাঁর জীবনেও নেমে এল উৎপীড়ন। হাসি মুখে সেই লাঞ্ছনা 'ডাক্তারবাবু' মেনে ছিলেন! কারণ এই প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মন্ত্র— 'নমস্তে সদা বৎসলে মাতৃভূমে'। অর্থাৎ 'সর্বাবস্থায় দেশের এই মাটি আমার পূজ্য।' একথা মেনে রেখেই 'ডাক্তারবাবু'-র এই সহনশীলতা। যে কোনো ব্যক্তির কর্মের ও সেবার প্রবাহ বোধহয় একটা জায়গায় এলে ভগবান থামিয়ে দেন। শ্রদ্ধেয় 'ডাক্তারবাবু'র ক্ষেত্রেও সেই ঘটনা ঘটেছে বলে মনে হয়। চর্ম চক্ষে আজ আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না! কিন্তু তিনি আমাদের মধ্যে আছেন, থাকবেন। তাঁর এই 'প্রয়াণ' শিবপুর তথা হাওড়ার শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, বলতে গেলে হাওড়ার সামগ্রিক জনজীবনে এক অপূরণীয় ক্ষতি। শ্রদ্ধেয় 'ডাক্তারবাবু'— ডাঃ সুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার বিনম্র প্রণাম।

—রণজিৎ সিংহ,
কলকাতা-৭০০০৩৬।

ভাষার অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রসঙ্গে

প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। বলতে গেলে একমাত্র মানুষই তার ভাবনা ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন ভাবে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করত। পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, বন-জঙ্গল, জলাভূমি-মরুভূমি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তির জন্য একগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য গোষ্ঠীর যোগাযোগ কমই ঘটতো। প্রতিটি গোষ্ঠীর ভাষা ছিল আলাদা আলাদা এবং ভাষার সংখ্যা ছিল অসংখ্য।

মানুষ ক্রমশ সভ্য হওয়ায় নিকটতম গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যোগাযোগ ঘটতে শুরু করে। যোগাযোগে সৃষ্টি হতো এক নতুন ভাষার। মানুষ যত বেশি সভ্য হতে থাকে, তত বেশি ভাষার মিশ্রণ ঘটে। এর ফলে ভাষার সংখ্যা কমতে থাকে। এভাবে ঘটতে থাকলে হয়তো একদিন পৃথিবীর ভাষা কমতে কমতে এক সমন্বয়ী ভাষার সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে বিশ্ববাসীরা কথা বলবে।

চিঠিপত্র

কোনো ভাষা লুপ্ত হলে কষ্ট পাওয়ারই কথা। যদি কোনো ভাষাকে জোর পূর্বক লুপ্ত করার চেষ্টা করা হয় তবে তা রুখতে হবে। যেমন, বাংলা ভাষার উপর উর্দু চাপাবার বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল যা ছিল অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। আবার ভাষার মধ্যে ভিন্ন ভাষার শব্দ স্বাভাবিক গতিতে প্রবেশ করে, তাতে দোষের কিছু নেই। ভাষা পরিবর্তনশীল। একশো বছর আগে ইংরেজি ভাষার যে রূপ ছিল তা আজ নেই। একশো বছর পর আজকের রূপটি থাকবে না। পৃথিবীর হাজার হাজার নদ-নদীর জল যেমন মহাসাগরে মিলে একাকার হয়ে যায়, ঠিক সেভাবে হয়তো সব ভাষা মিলে একাকার হয়ে এক হয়ে যাবে। এক হওয়ার পরও ভাষাটি বিবর্তিত হতে থাকবে, তবে সর্বজনীন ভাষা হিসেবে। সেদিন হয়তো কবির কথা 'সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই' সত্য হয়ে উঠবে।

—রাজকুমার জাজোদিয়া,
কালিয়াগঞ্জ।

অনুপ্রবেশকারীরা বাংলাদেশে ফিরতে শুরু করেছে

একটি জনপ্রিয় কাগজে দেখতে পেলাম ভারত নাকি পুশব্যাকের মাধ্যমে প্রচুর মানুষ বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত পাঠাচ্ছে। আজব খবর, জল বর্তমানে সাগরে না ঢুকে হিমালয় পর্বতে বাসা তৈরি করছে। কথাটা এই জন্য বলছি বাংলাদেশে বিএনপি'র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেছেন, প্রতিনিয়ত নাকি বিএসএফ বাংলাদেশিদের গুলি করে মারছে। কথাটা অবাকই শুধু করছে না কিছুটা বাকরুদ্ধ করার মতো

অবস্থা। আমরা জানি নিশাচররা রাত্রেই বেশি চলাফেরা করে। তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য। কারণ গোরু পাচার, মালপাচার দিনে সম্ভব নয়। তাছাড়া বিএসএফ তো আর অত বোকা নয় যে চোর ছ্যাচর বাদ দিয়ে সাধারণ মানুষকে মারবে, আর সাধারণ ও নিরীহ মানুষের চলাফেরা বর্ডারের ধারে হবেই বা কেন? আরেকটি কথা রিজভি বলেছেন, ভারত নাকি ফেনী নদীর জল ব্যবহার করছে। এই নদীটি বাংলাদেশের নতুন হিমালয় পর্বত থেকে সৃষ্টি হয়েছে যে জলের স্রোত উল্টো মুখে বইছে? মহাসচিব আক্ষেপের সুরে আর একটি কথা বলেছেন, ভারত নাকি বাংলাদেশের কাছে একটি প্রস্তাব রেখেছে সেটার মর্মার্থ এই, পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই নাকি বাংলাদেশে যাওয়ার একটি অনুমোদন ইস্যু করতে। এই কথাটায় একটু হাসি পেল। বর্তমানে বাংলাদেশে যাওয়ার মতো অত্যুগ্র ইচ্ছা বোধকরি ভারতবর্ষের লোকের খুবই কম। বর্ডারে ১০০ জন লোক যাতায়াত করলে তার মধ্যে কুড়ি জন হিন্দু আর বাদবাকি ৮০ জনই বাংলাদেশের অহিন্দু বাসিন্দা। এখনো কিছু লোক তাদের পুর্বপুরুষের ভিটে এবং কিছু আত্মীয়ের মুখ দেখতে যায় তবে তার পরিমাণ খুবই নগণ্য। ভারত যদি বর্ডার সিল করে তবে বাংলাদেশিরা বিরাট চিকিৎসা সংকটে পড়বে। তার কারণ হিসেবে আমি মনে করি, অহিন্দু বেশিরভাগ রোগী এখানে আসতে না পারলে উন্নত চিকিৎসার অভাবে সংকটে পড়বে। এ ব্যাপারে রিজভিবাবু অহেতুক হাসিনা সরকারের গায়ে কলঙ্ক লেপন করেছে। কারণ আওয়ামিলিগ নাকি এ ব্যাপারে মেরুদণ্ডহীন সরকারে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও বলেছেন সিএএ এবং এনআরসি নাকি ভারতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, কিন্তু সেটা ভেবে এত বড়ো জিনিসটাকে তাচ্ছিল্য করলে চলবে না। যদিও সিএএ বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের একটি বহুদিনের প্রত্যাশিত নাগরিকত্ব প্রাপ্তি। কিন্তু সেটাই পাকিস্তান বাংলাদেশ এবং ভারতের কিছু নেতা-নেত্রী ও বুদ্ধিজীবীদের ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের সবারই এক যোগে ইচ্ছা এইসব শরণার্থীদের নাগরিকত্ব না দিয়ে পৃথিবীর বাইরে কোথাও খেদিয়ে দেওয়া। তাতে এদের মনের ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর।

ছাত্র ও যুব সমাজের আদর্শ কে— কাসভ, আজমল না ক্ষুদিরাম

স্বার্থসাধনে খ্যাতনামা বাঙ্গালিদের কেউ কেউ ভারতের নাগরিকত্ব ছেড়ে বিদেশের নাগরিকত্ব নিয়ে গর্ববোধ করে। আবার স্বদেশীয় সহধর্মিণীকে বাদ দিয়ে বিদেশিনীকে সহ্য করেছে। নোবেল প্রাপকদের মধ্যে ব্যতিক্রম মহম্মদ ইউনুস। তাদের বংশধরেরা স্বাভাবিকভাবেই অভারতীয় বলেই গর্ববোধ করে। নোবেল প্রাপকদের বংশধররা শুধু অভারতীয়ই নন, তাঁরা ভারতবর্ষ নিয়ে জানতেও আগ্রহী নন।

এসব বুদ্ধিজীবীদের ঈপ্সিত স্বার্থ চিন্তা দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিরোধী যেমন, তেমনি শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের কাছে ভারত বিরোধী বার্তাও দিচ্ছে। এদের ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাজকর্ম নিয়ে জেহাদি মুসলমানদের কাজকর্ম নিয়ে কিছু বলতে শোনা যায় না। এরা ইসলামিক দেশের কুপ্রথা নিয়ে না কিছু বলতে পারে, পারেন না ভারতের খণ্ডিত অংশ তথা পাকিস্তান, বেলুচিস্তান, বাংলাদেশের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষাহীনতা নিয়ে। কেনই বা সেদেশের নাগরিক সংখ্যালঘুদের জিম্মি বলে অভিহিত করা হয়, তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে হয় বর্তমানে এদের ভারতের প্রতি মায়া দেখানো ও এক অভিনয় মাত্র। যখন ভারতের পথভ্রষ্ট ছাত্র ও যুব সমাজ ধ্বনি দেয়— ভারত তেরে টুকরে হোঙ্গে, ইনসাল্লা, ইনসাল্লা, আফজল হাম শরমিন্দা হ্যায়, তেরা কাতিল জিন্দা হ্যায়, বুরহান মাংগে আজাদি, কাশ্মীর মাংগে আজাদি, অসম মাংগে আজাদি, ভারত কী বরবাদিতক, জঙ্গ রহেগি, জঙ্গ রহেগি। তখন বুদ্ধিজীবী বিশ্বনাগরিকগণ শীতঘুম দেয়।

তিরিশের দশকে এই ছাত্র ও যুব সমাজ দেশাত্মবোধের আলোকে বন্দে মাতরম্ বলতে বলতে কতজন যে, বেঘোরে প্রাণ দিয়েছিল, সে ইতিহাসও তালিকা আজও অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, বিপথগামী সমাজের মুখে আজ আফজল থেকে বুরহানের নাম গর্বের সঙ্গে শোনা যায়। তাদের মৃত্যুদিনকে কেউ কেউ শহিদ দিবসের মান্যতা দেয়। অথচ কোনো যুব সমাজের পক্ষ হতে গত ডিসেম্বরে মতিলাল মল্লিক, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, রোহিণী রঞ্জন বড়ুয়া, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত, রামপ্রসাদ বিসমিল, রোশন সিংহ, সুন্দর সিংহ আসকাফউল্লা খান, রেচনচেরো, রাজনারায়ণ মিশ্র, যশবন্ত সিংহ ঠাকুর, দেবনারায় তেওয়ারীদের ফাঁসি হয়েছিল, তা তাদের মুখে শোনা যায় না। তেমনি এই জানুয়ারি মাসেও সূর্যসেন, তারকেশ্বর দস্তিদার, প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শ্রীকৃষ্ণ সার্দ, শংকর মাহালী, হেমু কালমীরাও যে দেশকে ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্ত করতে ফাঁসিতে জীবন দিয়েছিল, সেই ইতিহাস পাঠ্য বইতেও নেই। তেমনি হালের বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ভাবনাতেও তার প্রকাশ নেই। আছে বুরহান কাসভদের কথা। যদি বর্তমানে বিদেশি হওয়া ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের থেকে বর্তমানের স্বদেশীয় বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের কাছে দেশ ভক্তির অন্তত ভাষণ থাকত, তবে আজকের রাজনীতি তৃতীয় শ্রেণীর মেধাযুক্ত মানুষের এত রমরমা থাকত না। যেমন বৃদ্ধপিতা-মাতার কাছে যায়— অশিক্ষিত ছেলেই প্রিয়, বিদেশে থাকা পণ্ডিত ছেলে নয়, শেষ সম্বলও নয়।

—রাধাকান্ত ঘোড়াই,
ডাবুয়াপুকুর, পূর্বমেদিনীপুর।

জলপরিদের জীবন গাথা

নন্দিতা দত্ত

আজকাল 'ওটা মেয়েদের কাজ', 'এটা মেয়েদের কাজ নয়' বলে সীমা নির্ধারণ করে মেয়েদের থামিয়ে রাখা যায় না। সমাজ, প্রকৃতি, পরিস্থিতির সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিজের এবং পরিবারের প্রয়োজনে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ মেয়েরা করছে। শুধু কি শহরের মেয়েরা? না, গ্রামীণ মেয়েদেরও জীবন জীবিকার প্রয়োজনে কাজ করতে দেখা যায়। নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্রে আলাদা শ্রেণী ভাগ করা যায় না। কৃষি জমি তৈরি থেকে চারা লাগানো, ফসল ঝাড়াই বাছাই, ফসল তোলার পাশাপাশি ফুল-ফল চাষের ক্ষেত্রেও মেয়েরা এগিয়ে রয়েছে। আবার গোরু, শুয়োরের খামার থেকে পোলট্রি ফার্ম, বাঁশ ও বেতের কাজসহ কত কী যে করে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারী-পুরুষের সমান যোগদান পরিবারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই। নারীরা সংসারের হাল ধরার পাশাপাশি নৌকার বৈঠাও বায়। সেটা পারিবারিক প্রয়োজন হোক বা বছরের কাজের মাঝে বিনোদনের জন্যই হোক।

মা, বোন, স্ত্রী হয়ে সংসারে নারীর ভূমিকা ভিন্ন ভিন্ন। যুগ, সময় পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে সব কাজে নারীর পদচারণা। সেখানে বৈঠা হাতে নারী! না, অবাস্তব নয়। লোককথায় আমরা বৈঠার হাল ধরতে মেয়েদের দেখেছি। লোককথার পৃষ্ঠা থেকে বাস্তবের নারীদের দেখি বাইচ প্রতিযোগিতার বিনোদনে আর প্রতিদিনের যাপিত জীবনে।

ত্রিপুরার মেলাঘরে রুদ্রসাগরে প্রতি বছর বাইচ প্রতিযোগিতায় যারা অংশ নেয় তাদের থেকে জীবন একটু আলাদা— চন্দনমুড়া গ্রামের জ্যোৎস্না, কমলা, সাগরিকার বা কুর্তি হাওরের ঝরনা বা পিয়ারা বেগমের।

মেলাঘরের রুদ্রসাগরের নৌকা চালানো প্রতিযোগিতায় প্রতি বছর অংশ নেয় যুবরাজ ঘাট, কেমতলী, রাজেন্দ্র নগর, বৈদ্যমুড়া, চন্দনমুড়ার মেয়েরা। কোসা নৌকা, সারেঙ্গা,

অঙ্গনা

ডিঙি নৌকায় প্রতি বছর প্রতিযোগিতায় নামে যারা তারা ছোটোবেলা থেকেই জলের সঙ্গে পরিচিত। অঞ্জলি দাস, প্রীতি, স্মৃতি, উৎপলা, সন্ধ্যা, শিখা, ঊষা, রূপালি, সোমা— এরা প্রত্যেকেই বৈঠা হাতে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে পুরস্কার তুলে আনে।

রাজেন্দ্র নগরের রূপসী বর্মণ। না, তাকে জীবন জীবিকার প্রয়োজনে নৌকা চালাতে হয়নি। তিনি প্রতিবার নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নেতৃত্ব দিয়ে তার দলকে 'সেরার শিরোপা এনে দেন। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে স্বামীর মৃত্যু। ছোটো দুটি বাচ্চা নিয়ে জীবন রুক্ষ, ধূসর মরুভূমির মতো হলেও বিনোদন বা বাঁচার আনন্দ খুঁজে নিয়েছেন বৈঠা হাতে নিয়ে। ২০০৯ সালে জম্মুতে অনুষ্ঠিত ১৫তম সিনিয়র উওমেন ওয়েট লিফটিং-এ নব্বই কেজি বিভাগে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। জাতীয় স্তরের এই প্রতিযোগিতায় রূপসী বর্মণের নজর কাড়া সাফল্য রাজ্যের সম্মান এনে দিয়েছে। রুদ্রসাগর নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় তাঁর নেতৃত্বে তাঁর দলের প্রথম স্থানটি বাঁধা ছিল। যত প্রতিকূলতা থাকুক বৈঠা হাতে নৌকায় গতি আনতে অন্যদের উজ্জীবিত করতে গানও করেন।

উনকোটি জেলার খাওড়া বিলে বেশ কয়েক বছর নৌ-বাইচ প্রতিযোগিতায় মেয়েদের দল অংশ নিয়েছে। এরা শুধু বিনোদনের জন্যই নৌকা নিয়ে নিজেদের ব্যস্ত রাখে। এরা কখনও এমনিতে নৌকা চালায় না। এরা হলেন— জবা নমঃশূদ্র, সন্ধ্যা নমঃশূদ্র, বিদ্যা নমঃশূদ্র, শুক্লা নমঃশূদ্র ও ঊষা নমঃশূদ্র। এদের বাড়ি এই বিলের আশেপাশের গ্রামে। প্রত্যেকেই গৃহবধূ। রুদ্রসাগর, খাওড়া বিল, কুর্তি হাওর তিনটি অঞ্চলের মধ্যে রুদ্রসাগরে নীরমহলকে কেন্দ্র করে পর্যটন ব্যবস্থা। অন্য দুটি ক্ষেত্রে পর্যটন সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু তিনটি অঞ্চলে জল, নৌকা ও নারীর সম্পর্কে নারী-অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী এ বিষয়টির কোনও ভূমিকা নেই। মূলত নিজেদের প্রয়োজন ও বিনোদন কেন্দ্রিক নারীর হাতে বৈঠা এবং এই সব অঞ্চলের নারীরা যাঁরা জীবনের প্রয়োজনে বৈঠা হাতে নিয়েছেন তাদের কারোরই নৌকার ব্যক্তিগত মালিকানা নেই। তাঁরা প্রত্যেকেই অন্যের নৌকা চালিয়ে থাকেন প্রয়োজনে। তাঁদের এই সহজাত দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পর্যটনে তাঁদের অংশগ্রহণ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নতুন রাস্তা দেখাতে পারে। ■

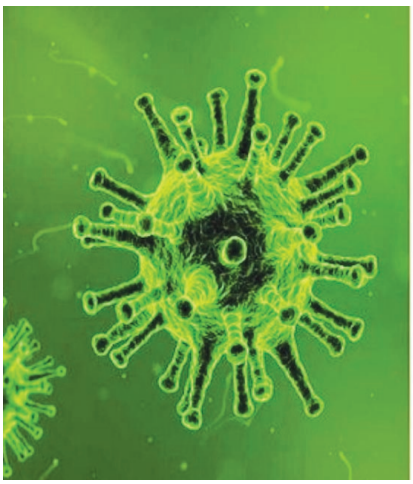

করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধে করণীয়

বিশেষ প্রতিনিধি॥ রহস্যময় নতুন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ দ্রুত ছড়াচ্ছে। সারা বিশ্বে এই ভাইরাসের আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। চিরায়ত ভারতীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা— আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি এবং ইউনানির মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে কেন্দ্রের আয়ুষ মন্ত্রকের গবেষণা পর্ষদ কিছু পরামর্শ জারি করেছে। আয়ুর্বেদ চিকিৎসা পদ্ধতি অনুসারে রোগ প্রতিরোধের গৃহীত ব্যবস্থাগুলি হলো :

● ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা।

● সাবান ও জল দিয়ে ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোবেন।

● মুস্তা, পারপাত, উশির, চন্দন, উদিচ্চ এবং নগরের মিশ্রণের ১০ গ্রাম পাউডারকে ১ লিটার জলে ফোটাতে থাকুন। যখন মিশ্রণের পরিমাণ অর্ধেক হবে তখন এটিকে সংগ্রহ করে তেষ্টা পেলে পান করুন।

● হাত না ধুয়ে আপনার চোখ, নাক, মুখ ছোঁবেন না।

● অসুস্থ লোকেদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখুন।

● যখন আপনি অসুস্থ থাকবেন তখন ঘরেই থাকুন।

● হাঁচি, কাশির সময় আপনার হাত ধোবেন এবং মুখ কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখুন।

● যে জিনিসগুলিকে ঘনঘন স্পর্শ করেন তা পরিষ্কার ও জীবাণুমুক্ত রাখুন।

● কোথাও যাওয়ার সময় এ-৯৫ মাস্ক ব্যবহারের চেষ্টা করুন।

● যদি সন্দেহ করেন যে আপনি করোনা ভাইরাস আক্রান্ত তাহলে মুখোশ পরুন এবং নিকটবর্তী হাসপাতালের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ যোগাযোগ করুন।

● আয়ুর্বেদিক চিকিৎসাশাস্ত্র অনুসারে স্বাস্থ্যকর খাবার এবং জীবনশৈলী বজায় রাখার মাধ্যমে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করুন।

● দিনে দু-বার গরম জলের সঙ্গে অগস্ত হরিতকি খান।

● প্রতিদিন দুটি করে ৫০০ মিলিগ্রামের সামসামানি বুটিক খান।

● এক লিটার জলে পিতটি, মরিচ ও সুনথির ৫ গ্রাম পাউডারের সঙ্গে ৩-৫টি তুলসীপাতা দিয়ে জল ফোটান। জলের পরিমাণ অর্ধেক হয়ে গেলে তারপর প্রয়োজন মতো তা সেবন করুন।

● প্রতিদিন সকালে নাকের ফুটোয় দু-ফোঁটা করে অণু তেল দেবেন।

নিবন্ধীকৃত আর্য়ুবেদ চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আয়ুষ মন্ত্রকের সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিয়োপ্যাথি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য হোমিয়োপ্যাথ ওষুধের প্রয়োগ সম্পর্কে ২৮ জানুয়ারি বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা পর্ষদের ৬৪তম বৈঠকে আলোচনা করেছে। এই ভাইরাস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আর্সেনিক অ্যালবাম ৩০ খালি পেটে এক ফোঁটা করে তিন দিন খেতে হবে। এই ভাইরাসের সংক্রমণের থেকে বাঁচতে ইউনানি পদ্ধতিতে যেসব ওষুধ ব্যবহার করা যায় সেগুলি হলো— ১. সরবত উন্নাম দিনে ২ বার করে ১০-২০ মিলিলিটার। ২. তিরিয়াক আরবা ৩-৫ গ্রাম দিনে ২ বার করে। ৩. তিরিয়াকে নাজলা ৫ গ্রাম করে দিনে ২ বার। ৪. খামিরা মাওয়ারিদ প্রতিদিন ৩-৫ গ্রাম তালু এবং বুকে রোগান বাবোনা/রোগান মম/কাফোরি মলম মালিস করতে হবে। নাকে হালকাভাবে রোগান বানাফসা মালিস করতে হবে। প্রতিদিন চারবার ৪-৮ ফোঁটা আজিদ আরক জলে মিশিয়ে খেতে হবে। জ্বর হলে ঈষদুষ্ণ জলের সঙ্গে দিনে ২ বার হাব-এ-ইকসিরবুখার দুটি ট্যাবলেট খেতে হবে। দিনে ২ বার ১০০ মিলিলিটার ঈষদুষ্ণ জলে ১০ মিলিলিটার সরবত নাজলা মিশিয়ে খেতে হবে। দিনে ২ বার কুর্স-এ-সুয়েল ট্যাবলেট ২টি করে খেতে হবে। ইউনানি চিকিৎসকের পরামর্শক্রম সহজপাচ্য হালকা খাবার খেতে হবে। ▮

শরজিল ইমামদের পিছনে রয়েছে জর্জ সোরোসের টাকা

নক্কে দাঁড়িয়ে দেশবিরোধী বক্তব্য রাখছে শরজিল।

দীপ্তাস্য যশ

দীপিকা পাড়ুকোনের পরবর্তী সিনেমা '৮৩'। ভারতীয় ক্রিকেট দলের ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে এই সিনেমা। বিগ বাজেট ফিল্ম। এই সিনেমায় অন্যতম লগ্নিকারী রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্ট।

এবার একটা আপাত অপ্রাসঙ্গিক কথা বলি। জর্জ সোরোস সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করেছেন। তিনি জানিয়েছেন ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদের উত্থানকে তিনি ভালো চোখে দেখছেন না। একে প্রতিহত করতে তিনি এক বিলিয়ান ডলার বিনিয়োগ করবেন। সব কাগজেই এই খবর ছাপা হয়েছে। বাংলা কাগজগুলো যথারীতি এই এক বিলিয়ন ডলারের অংশটি চেপে গেছে। তবে খবরের পেছনেও কিছু খবর থাকে এবং সেই খবরগুলো থেকে জানলেই মূল খবর জানা যায়।

সাল ২০১১, বিধানসভা নির্বাচনে ৩৪ বছরের বাম সরকারকে পরাজিত করে ক্ষমতায় এলেন মমতা ব্যানার্জি। ক্ষমতায় আসার কিছু দিন পরেই হলদিয়া পেট্রোকেমে রাজ্য সরকারের শেয়ার ছেড়ে দেন এবং হলদিয়া পেট্রোকেমের পরিচালন ক্ষমতা পুরোপুরি চ্যাটার্জি গ্রুপের হাতে চলে যায়। আপাতভাবে এতে কোনো অসুবিধা নেই। কারণ সরকারের কাজ ব্যবসা করা নয়, সরকারের কাজ নীতি নির্ধারণ করা। কিন্তু তাও এই ঘটনার পেছনে কিছু ঘটনা আছে যা আমাদের জানা দরকার।

বলুন তো কোন ঘটনায় বামেদের পতনের শুরু হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গে? সবাই উত্তর দেবেন নন্দীগ্রামের গুলি চালনার ঘটনাই বামেদের পতনের মূল কারণ। ঠিকই বলবেন। এবার বলুন তো এই নন্দীগ্রামের ঘটনা কেন ঘটেছিল? সবারই মনে আছে নন্দীগ্রামে পেট্রোকেমিক্যাল হাব তৈরি করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করাকে কেন্দ্র করে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সূচনা এবং পরবর্তীকালে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর নন্দীগ্রামের নিরীহ সাধারণ মানুষদের উপরে নৃশংস, নির্লজ্জ আক্রমণ। এর প্রতিবাদে সমস্ত বুদ্ধিজীবী রাস্তায় নামেন মমতার নেতৃত্বে। আন্দোলন নন্দীগ্রাম থেকে ছড়িয়ে পড়ে পুরো পশ্চিমবঙ্গে।

পুলিশ হেফাজতে শরজিল।

এবার একটু ভাবুন তো যে বুদ্ধিজীবীরা সামান্য কিছু সাম্মানিক আর কোনো একটা পদলাভের আশায় মুখ্যমন্ত্রীর পেছনে দাঁড়িয়ে তালি বাজিয়ে 'কা কা ছি ছি' গাইতে পারেন, যে বুদ্ধিজীবীদের সিংহভাগ বাম সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে এসেছেন ৩৪ বছর ধরে এবং তার দ্বারা নিজেদের সমাজে বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কোনো জাদুবলে হঠাৎ তাদের মেরুদণ্ড গজিয়েছিল নন্দীগ্রাম, সিঙ্গুরের সময়ে? উত্তর একটাই, তা হলো 'আখির পয়সা বোলতা হ্যায়'।

এবার একটু মনে করুন জর্জ সোরোস কী বলেছেন। তিনি বলেছেন এক বিলিয়ান ডলার তিনি ইনভেস্ট করবেন ভারতে জাতীয়তাবাদের উত্থানকে প্রতিহত করার জন্য। তার একটা বড়ো অংশ ব্যয় করা হবে এই বুদ্ধিজীবীদের ব্যাকিং দেওয়ার জন্য। কীভাবে ব্যাকিং দেওয়া হবে? কখনও সরাসরি টাকা দেওয়া হবে। আবার কখনও

ম্যাগসাইসাই বা বুকার পাইয়ে দেওয়া হবে এবং তাদের সমাজে বুদ্ধিজীবী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হবে। একই ভাবে নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময়েও তাদের নানা ভাবে পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তার পরিবর্তেই তারা নন্দীগ্রাম আন্দোলন নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন।

নন্দীগ্রাম আন্দোলনে বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করার মতো উপস্থিতি ছিল বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনগুলির। এবার আপনাদের আরও একটি তথ্য জানাই। জর্জ সোরোস বিশ্বের সব থেকে বড়ো ফিলানথ্রপিস্টদের মধ্যে একজন। সারা পৃথিবী জুড়ে বেশিরভাগ বড়ো বড়ো এনজিও যেমন গ্রিন পিস বা পেটা এনার অর্থানুকূল্য পেয়ে থাকে। এবার চেইনটা বোঝা গেল? জর্জ সোরোস পয়সা ঢালবেন গ্রিন পিস বা পেটার মতো বড়ো বড়ো সংস্থাগুলোতে। যেগুলো নামেই এনজিও। আদতে এরা সবাই বিশাল কর্পোরেট সংস্থা। এরা আবার সেই টাকা নানাভাবে ডিস্ট্রিবিউট করে দেবে মাঝারি এবং ছোটো এনজিওগুলোর মধ্যে এবং গড়ে উঠবে একটা নেটওয়ার্ক। যে নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে সামাজিক আন্দোলনের নামে কখনও বন্ধ করে দেওয়া হবে কলকারখানা আবার কখনও গরিব চাষিকে ঠকিয়ে গড়ে উঠবে কলকারখানা। অর্থাৎ ইনভেস্টরের স্বার্থ বজায় রাখতে যা যা করা দরকার তা এরা করবে।

মনে হতেই পারে ধান ভানতে শিবের গীত গাইছি। কোথায় হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল আর কোথায় জর্জ সোরোস আর কোথায় নন্দীগ্রাম। যতসব আবোল তাবোল কথা। আপাতভাবে দেখলে তাই মনে হবে। কিন্তু ওই যে শুরুতেই বলেছি খবরের পেছনেও খবর থাকে। এবার আসি সেই পেছনের খবরের কথায়। হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যালের অন্যতম অংশীদার ছিল চ্যাটার্জি গ্রুপ। চ্যাটার্জি গ্রুপের অন্যতম ইনভেস্টার বা বিনিয়োগকারী জর্জ সোরোসের সোরোস গ্রুপ। চ্যাটার্জি গ্রুপের মূল শর্ত ছিল যদি এই প্রকল্পের কোনো পার্টনার কখনও তার শেয়ার ছেড়ে দেয় তাহলে প্রথমে বাকি অংশীদারদের কাছে প্রস্তাব দিতে হবে। তারা যদি কিনতে অপারগ হয় তবেই এক মাত্র বাইরের কাউকে এই শেয়ার বিক্রি করা যেতে পারে।

এই নির্দিষ্ট শর্তটি নিয়েই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জমানায় চ্যাটার্জি গ্রুপের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের টালবাহানা শুরু হয়। চ্যাটার্জি গ্রুপ তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার জন্য সংস্থার পুরো নিয়ন্ত্রণ চায়। কারণ ভারতে এবং বিশ্বের বাজারে প্লাস্টিক প্যাকেজিং-এর চাহিদা তখন বাড়ছে দ্রুতহারে। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের নানা জটিলতার কারণে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল তাদের ব্যবসা সেই অনুপাতে বাড়াতে পারছে না। রিলায়েন্স যদিও প্লাস্টিক প্যাকেজিং কাঁচামালের সব থেকে বড়ো উৎপাদক কিন্তু তাদের ব্যবসার বেশিরভাগটাই ভারতের বাইরে। ভারতে এই মার্কেটে এখন সব থেকে বেশি ব্যবসা করে হলদিয়া পেট্রোকেমিক্যাল। তাই সেই সময়ে একদিকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নানা জটিলতা অপরদিকে শিল্পের জন্য বুদ্ধবাবু নন্দীগ্রামে জমি দিতে চাইছেন সেলিম গ্রুপকে পেট্রোকেমিক্যাল হাব খোলার জন্য। যারা ভারতের এই বাজার ধরতে বিশাল টাকার বিনিয়োগ করতে চায়।

এই সময় তাই ব্যবসায়িক স্বার্থেই চ্যাটার্জি গ্রুপের হলদিয়া পেট্রোকেমকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেওয়া দরকার ছিল এবং তারা চাইছিল না সেলিম গ্রুপ তাদের পেট্রোকেম হাব স্থাপন করুক। সেই কারণেই এনজিও সংস্থাগুলির মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করানো হয়।

চ্যাটার্জি গ্রুপ এই আন্দোলনকে অক্সিজেন দিতে মমতার সমর্থনে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী এবং এনজিওগুলোকে প্রভাবিত করে আন্দোলনে নামায়। যার ফলশ্রুতিতে বাম সরকারের পতন এবং মমতা ব্যানার্জির 'অষ্টম বাম' সরকার গঠন। এই পালা বদলের পরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকার হলদিয়া পেট্রোকেমে তাদের অংশীদারিত্ব চ্যাটার্জিগ্রুপকে বিক্রি করে দেয় এবং চ্যাটার্জি গ্রুপ সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেয়। বলা বাহুল্য এতে অবশ্যই সোরোস গ্রুপ যারা কিনা চ্যাটার্জি গ্রুপে অন্যতম বিনিয়োগকারী ছিল তাদেরও স্বার্থ রক্ষা হয়।

একই সময়ে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। তা হলো মনমোহন সিংহের সেই সময় করা আমেরিকার সঙ্গে নিউক্লিয়ার ডিল। এই ডিলটি অবশ্যই চায়নার স্বার্থের পরিপন্থী ছিল এবং সেই কারণে ভারতে চীনের সেই সময়ের সব থেকে বড়ো বন্ধু কমিউনিস্টরা এর বিরোধিতা করে। এই বিরোধেও জর্জ সোরোসের স্বার্থহানির কারণ ঘটেছিল।

ভারতে বিভিন্ন পরমাণু প্রকল্পে ব্যবহৃত ইউরেনিয়ামের বেশিরভাগটাই আসে বাইরে থেকে। জর্জ সোরোসের বিনিয়োগের একটা বড়ো অংশ যায় ইউরেনিয়াম ট্রেডিং-এ। ক্যামেকো কর্পোরেশান, যা কিনা বিশ্বের সব থেকে বড়ো ইউরেনিয়াম ট্রেডার, তাতে সোরোস গ্রুপের একটা মোটা বিনিয়োগ আছে। স্বাভাবিক ভাবেই ভারত আমেরিকার মধ্যে নিউক্লিয়ার ডিল হলে ক্যামেকো কর্পোরেশান সেখান থেকে বেশ মোটা টাকার ব্যবসা পাবে। এমতাবস্থায় বামেরা এই নিউক্লিয়ার ডিলের বিরোধ শুরু করলে তা সোরোস গ্রুপের ব্যবসার পক্ষে ভালো নয়। তাই এই সমস্যা দূরীকরণে সংসদীয় বামেদের শক্তিহীন করাটা জরুরি ছিল সেই সময়ে। আর সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে বামেদের পতন ঘটানো জরুরি ছিল।

সেই সময়ে সংসদে বামেদের যে ৬১টি আসন ছিল তার বেশিরভাগটাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রাপ্ত। কেরলেও বামেরা শক্তিশালী কিন্তু সেখানে তাদের পশ্চিমবঙ্গের মতো একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গে বামেদের পতন জরুরি ছিল। তাই নন্দীগ্রাম থেকে যা শুরু হয়েছিল তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে সিঙ্গুর এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য অংশে। জায়গায় জায়গায় গড়ে ওঠে জমিরক্ষা কমিটি। ধাক্কা খায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের যাবতীয় শিল্পোদ্যোগ। এই পরিকল্পনা সফল করতে বিশেষ বেগও পেতে হয়নি সোরোসদের। অনিল বিশ্বাসের পর সিপিএমের নিয়ন্ত্রণ তখন বিমান, বিনয়দের হাতে। তারা ভাবলেন মরিচঝাঁপি, বিজন সেতু ট্রিটমেন্ট দিয়েই তারা সব ঠাণ্ডা

করে দেবেন। কিন্তু তারা এটা বুঝলেন না মানুষ অনেকদিন আগে থেকেই সিপিএমের ঔদ্ধত্য, লোকাল কমিটির অত্যাচারে বিরক্ত, ক্রুদ্ধ। এমতাবস্থায় তারা একটি বিকল্প শক্তির সন্ধানে আছে। সেই বিকল্প শক্তির সন্ধান দেওয়া হলো মানুষকে মমতা ব্যানার্জির উত্থান ঘটিয়ে। অনেকে হয়তো বলবেন মমতা ব্যানার্জির বিরোধিতার ইতিহাস অনেক পুরনো। সেটি অবশ্যই ঠিক কথা। কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য সেই সময়ে এক বিশাল সংখ্যক বুদ্ধিজীবী, এনজিও এবং অতিবাম সংগঠনগুলির সমর্থন না পেলে মমতা ব্যানার্জির পক্ষে সিপিএমকে সরানো সম্ভব হতো না। ২০০১-এর বিধানসভা ভোট তার সাক্ষী।

সোরোসের এই এনজিও নেটওয়ার্ক মোদী জমানায় কীভাবে ধাক্কা খেয়েছে তা বোঝানোর জন্য একটি উদাহরণ দেব। ভারতবর্ষের অন্যতম বড়ো এনজিও ছিল কম্প্যাশন ইন্টারন্যাশানাল। আমেরিকার কোলারাডোর এই খ্রিস্টান চ্যারিটি সংস্থাটির অন্যতম ডোনার জর্জ সোরোস। নরেন্দ্র মোদী সরকার এনজিওগুলিতে বিদেশি অর্থ বিনিয়োগ নিয়ে কড়াকড়ি শুরু করার পর এই সংস্থাটি ভারতে তাদের কার্যকলাপ বন্ধ করে।

ভারতে সোরোসদের ব্যবসা কী? উত্তর হলো কোনো একটি নয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের বিনিয়োগ আছে। অনিল আম্বানীর এন্টারটেইনমেন্ট সংস্থা রিলায়েন্স এন্টারটেইনমেন্টে তারা প্রায় ১০০ মিলিয়ান ডলার বিনিয়োগ করেছে ২০০৮ সালে। এবার তাহলে বোঝা গেল প্রথম লাইনে কেন দীপিকা পাড়ুকোনের উল্লেখ করা হয়েছে আর কেনই বা দীপিকা পাড়ুকোন জেএনইউতে গেছিলেন।

ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমসের মতো কাগজেও সোরোসের বিনিয়োগ আছে। আশা করি আপনাদের সবারই মনে আছে এই সেই বিখ্যাত হেডিং, 'ডিভাইডার ইন চিফ'। যাতে কিনা একটি গণতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কালিমালিপ্ত করার প্রবল প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। জর্জ সোরোস সারা বিশ্বের প্রায় ৩০টি প্রথম সারির মিডিয়া হাউসে বিনিয়োগ করেছেন। এছাড়াও ভারতে রিয়াল এস্টেট, লজিস্টিকস ক্ষেত্রেও সোরোস গ্রুপের বিনিয়োগ আছে। একটা মোটা অঙ্কের বিনিয়োগ আছে বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জে। রাজনীতিতে নাক গলানোর অভ্যেসটি অবশ্য সোরোসের নতুন নয়। এর আগে ২০০৪ সালে জর্জ বুশকে হারানোর জন্য লিববালপন্থী এই ব্যবসায়ী প্রায় ২৭ মিলিয়ান ডলার লাগিয়েছিলেন। সোমালিয়া, কসোভোতে জঙ্গিদের মদত দেওয়ার অভিযোগও আছে তার বিরুদ্ধে। এমনকী তার নিজের দেশ হাঙ্গেরি থেকেও তিনি এইসব কারণে বিতাড়িত। সেখানে তার ইউনিভার্সিটি, ব্যবসা সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

জর্জ সোরোস বামেদের বিশেষ অক্সিজেন জোগাবেন না। কারণ তিনি জানেন সেটা ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট। তিনি তাই ভরসা রাখছেন শরজিল ইমামদের উপরে। যারা ক্রমাগত সংখ্যা বাড়িয়ে এই দেশের রাজনীতি, সমাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় এবং জর্জ সোরোস চান সেই রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ভারতের মতো একটি বৃহৎ বাজারের অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ। তাই আজ 'মানতাবাদী' জর্জ সোরোস সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতা করছেন। ■

জর্জ সোরোস— এই মহামান্য ব্যক্তিটি হঠাৎ ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদের উত্থান নিয়ে এতো ভাবিত কেন। অবশ্যই তিনি নাগরিকত্ব আইন নিয়ে ভাবিত নন। কারণ সে সব ভাবনা থেকে পয়সা আসে না। তিনি চিন্তিত তার ব্যবসায়িক ক্ষেত্র নিয়ে। অ্যামাজনে সোরোস ফান্ড ম্যানেজমেন্ট গ্রুপের একটা বড়ো বিনিয়োগ আছে। নতুন ই-কর্মাস আইনের ফলে অ্যামাজনের একচেটিয়া ব্যবসার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাই জর্জ সোরোসের চিন্তার কারণ। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন নয়।

বামেরা জর্জ সোরোসকে নিয়ে এই মুহূর্তে উদ্বেলিত তার মোদী বিরোধী অবস্থানের কারণে। কিন্তু তারা জানেন না যে জর্জ সোরোস যে মোদী বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে চাইছেন সেখানে কানহাইয়া বা ঐশীদের জায়গা বিশেষ নেই। জায়গা আছে শরজিল ইমামদের। যাদের মুখ হিসেবে তুলে ধরার জন্য ১২০ কোটি টাকা খরচ করা হয়। কারণ সেই ইনভেস্টমেন্ট আবার তাকে ডিভিডেন্ড দেবে আরব দুনিয়ার পেট্রো মার্কেটে।

ঘুঘু এতদিনে ফাঁদে পড়েছে

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সম্প্রতি একটি সর্বভারতীয় টিভি চ্যানেলে শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হচ্ছিল। যে সাংবাদিক এই সাক্ষাৎকারগুলি নিচ্ছিলেন, তিনি এক আন্দোলনকারীকে বেশ মজার একটি প্রশ্ন করেছিলেন। জনৈক আন্দোলনকারীকে তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন— আচ্ছা, এই যে এখানে যারা অবস্থান করছেন তাদের জন্য চারবেলা যে খাবার পৌঁছে যাচ্ছে, সেই খাবার জোগান দিচ্ছে কে? এর উত্তরে ওই আন্দোলনকারী বলেছিলেন— আল্লাহ্ জোগাচ্ছেন। এরপর সাংবাদিক প্রশ্ন করেন— আল্লাহ জোগাচ্ছেন সে তো বুঝলাম। কিন্তু কার থেকে এই খাবারগুলো নিয়ে আসছেন আপনারা বা কে আপনাদের কাছে খাবার পৌঁছে দিচ্ছেন। এর উত্তরে ওই আন্দোলনকারী আবারও বলেছিলেন— সে আমরা জানি না। আমরা সকালে উঠে দেখছি আমাদের কাছে খাবার পৌঁছে যাচ্ছে। এই কথোপকথন থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোনো একজন সর্বশক্তিমান অন্তরাল থেকে শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের চারবেলা খাবার সরবরাহ করে চলেছেন। আর কী কী সরবরাহ করছেন, তাও ক্রমশ প্রকাশ হবে— এরকম আশা করাই যাচ্ছে। এই সাক্ষাৎকারের পাশাপাশিই ওই শাহিনবাগ অঞ্চলের আরও কিছু মানুষের সাক্ষাৎকারও ওই টিভি চ্যানেলটিতে তুলে ধরা হয়েছে। আর যে মানুষগুলির সাক্ষাৎকার তুলে ধরা হয়েছে তারা শাহিনবাগ অঞ্চলের বিভিন্ন বিপণীর মালিক, ব্যবসায়ী। শাহিনবাগে চলতে থাকা এই আন্দোলনের ফলে তাদের দোকানে বিক্রিবাটা লাটে উঠেছে। ব্যবসাপাতিও প্রায় বন্ধ। শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের প্রতি এই মানুষগুলি তিতিবিরক্ত। মাঝে একবার আন্দোলনকারীদের সঙ্গে এই ব্যবসায়ীদের তুমুল বাগবিতণ্ডাও হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যবসায়ীরা মনে করছেন, শাহিনবাগে আন্দোলনের নামে এই বিশৃঙ্খলা অবিলম্বে বন্ধ হোক। শাহিনবাগের ব্যবসায়ীদের কথা এই কারণেই উল্লেখ করলাম যে, শাহিনবাগের আন্দোলনের পিছনে যে স্থানীয় বাসিন্দা এই ব্যবসায়ীদের সমর্থন নেই, তা এদের সাক্ষাৎকারেই বোঝা যাচ্ছে। ফলে, এটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না যে, আন্দোলনকারীদের চারবেলা খাবারের প্যাকেট অন্তত এরা জোগাচ্ছেন না। তাহলে এটাই প্রশ্ন অন্তরালে থাকা সর্বশক্তিমান মানুষটি কে? তিনি আসলে

তদন্তে প্রকাশিত হয়েছে, ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠী পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে ১২০ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছে। তার ভিতরে কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলই একা ৭৪ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছেন।

শাহিনবাগের বাসিন্দা নন। অথচ চারবেলা খাবারের প্যাকেট জোগান দিয়ে শাহিনবাগের আন্দোলনটা জাগিয়ে রাখতে চান? শাহিনবাগের আন্দোলন দীর্ঘজীবী হলে তার কী সুবিধা? আসলে অনেককিছুই আমাদের জানার বাইরে থেকে যায়। যেমন, আজ অবধি আমরা জেনে উঠতে পারিনি, আধবেকার কানহাইয়া কুমারকে দেশের যত্রতত্র বিমানে ভ্রমণ এবং দামি হোটেলে রাত্রিবাসের টাকা কে জোগায়, কারা জোগায়? কাদের পয়সায় কানহাইয়া কুমার দেশের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে 'আজাদি'-র স্লোগান দিয়ে যান? কানহাইয়া কুমারের মতো আজাদিপন্থী নেতাদের তুলে ধরতে পারলে কার কতটা লাভ?

আসলে সর্বত্রই একজন সর্বশক্তিমান অন্তরালে কাজ করে যান। পুতুলনাচের সুতোটি তারই হাতে থাকে। কানহাইয়া কুমার থেকে শাহিনবাগের আন্দোলনকারী— সবাই সেই অদৃশ্য মানুষের হাতের সুতোর টানে নড়েন। যেমন, সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যগুলি বা এই রাজ্যেরই প্রধান প্রধান সংবাদমাধ্যমের কথাই ধরুন। শাহিনবাগ, পার্কসার্কাস, জামিয়া মিলিয়া, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গোষ্ঠীর আন্দোলনকে এরা স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হিসেবে প্রচার করছেন। শাহিনবাগ যেমন সমগ্র দিল্লি নয়, তেমনই পার্কসার্কাসও সমগ্র কলকাতা নয়। শাহিনবাগ দিল্লির একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল, পার্কসার্কাসও কলকাতার তাই। তেমনই জামিয়া মিলিয়া, জেএনইউ বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি বামপন্থী ছাত্ররাও দেশের সমগ্র ছাত্র সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন না। এদের বাইরে যে বৃহত্তর জনসমাজ রয়েছে তার বক্তব্য প্রতিফলিত হয় না কেন এই সংবাদমাধ্যমগুলিতে? বাংলাদেশ পাকিস্তান থেকে উচ্ছেদ হয়ে ভারতে বসবাসকারী শরণার্থীরা যে দুহাত তুলে সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনকে সমর্থন জানাচ্ছেন— দু-একটা সংবাদমাধ্যমকে বাদ দিলে অন্য সংবাদমাধ্যমগুলি তা প্রকাশ করে না কেন? এই কেন'র উত্তর অবশ্য এক বছর আগেই পাওয়া গিয়েছে। বছরখানেক আগে দিল্লিতে কুড়িজন তাবড় সাংবাদিকের এক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই কুড়িজন টিভির পর্দায় এবং খবরের কাগজে পরিচিত নাম।

প্রগতিশীল এবং সেকুলার--- এই এদের পরিচয়। গত বছর প্রকাশিত ওই তালিকায় দেখা গিয়েছে ওই কুড়িজনই একটি বিশেষ রাজনৈতিক পক্ষের কাছ থেকে প্রতি মাসে নিয়মিত মাসোহারা পান। পরিচিতি অনুযায়ী এই মাসোহারার পরিমাণ দেড় লক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজারের ভিতর। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে এরাই দল বেঁধে রাহুলবাবাকে ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, এরাই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন সংবিধান বিরোধী এমন একটি ধারণা জনসমক্ষে প্রচার করতে চাইছেন। দেড় লক্ষ থেকে পঞ্চাশ হাজারের বাঁধা মাসোহারা পেলেই অনেক কিছুই লেখা যায় না। লিখতেও নেই। সে জন্যই এরা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনমতের কথা তুলে না ধরে একটি ক্ষুদ্র অংশের আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে চালাতে চান।

এই রাজ্যের দিকে তাকান। গত আট বছরে এই রাজ্য থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচলিত সংবাদমাধ্যমগুলিতে রাজ্য সরকারের দুর্নীতি নিয়ে কোনো সংবাদ প্রকাশিত হয়নি। শাসকদলের সমলোচনামূলক একটি পঙ্‌ক্তিও কোথাও প্রকাশিত হয়নি। ব্যাপারটা এমন নয় যে রাজ্য থেকে দুর্নীতি সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গিয়েছে। বরং ব্যাপারটা উল্টোই। প্রশাসনের সর্বস্তরে ব্যাপক দুর্নীতির কথা এখন সর্বত্র আলোচিত। শাসকদলের দমনপীড়নও সকলের জানা। শুধু এই রাজ্যের সংবাদমাধ্যমগুলিই এই বিষয়ে নীরব? কেন? কারণ গত আট বছরে এই রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যমগুলি পরিচালনার দায়িত্ব যাদের হাতে, তারাই শাসকদল এবং সরকারের অর্থানুকূল্যে কোটিপতি হয়েছেন। কোনো সাংবাদিকের বেনামে দার্জিলিঙে রিসর্ট হয়েছে। কেউ কলকাতার উপকণ্ঠে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের প্রাসাদ বানিয়েছেন ইত্যাদি। কাউকে কাউকে তো এখন দুর্নীতির দায়ে ভুবনেশ্বরের জেলে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই যে রাতারাতি তারা ফুলে ফেঁপে উঠলেন— এর পরিবর্তে কলমটিকে তাদের বন্ধক রাখতে হচ্ছে। বদলে রাজ্যের কোনো প্রভাবশালী মন্ত্রীর মা অসুস্থ হয়ে পড়লে তার সেবায় সংবাদপত্র মালিককে হাসপাতালে রাত কাটাতে হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর তালে তাল মিলিয়ে জল উঁচু জল নীচু বলে যেতে হচ্ছে। আর তাল না মেলালে? তার উদাহরণও রয়েছে। রাজ্যের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিকের প্রাক্তন সম্পাদক তাল মেলাতে রাজি হননি। ফলে নিজের সাম্রাজ্য থেকেই উৎখাত হতে হয়েছে তাঁকে।

আসলে আমরা সকলেই সবকিছু জানি। কিন্তু অন্তরালে থাকা ওই সর্বশক্তিমানদের মুখোশটি উন্মোচিত করা যায় না। তারা থেকে যায় ধরাছোঁয়ার বাইরে। যেমন সিঙ্গুরে যখন টাটা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছিল, তখন কানাঘুষোয় শোনা গিয়েছিল ওই বিক্ষোভে মদত জোগাচ্ছে একটি গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থা, যারা টাটদের প্রতিদ্বন্দ্বী। এবং এও শোনা গিয়েছিল, বিক্ষোভকারীদের অর্থ-সহ নানাবিধ সাহায্যও করছে এরা। সিঙ্গুরের ওই বিক্ষোভের ফলে টাটারা এখানে ওই প্রকল্প আর করেননি। চলে গিয়েছিলেন গুজরাটের আনন্দে। কিন্তু তারপর কী হয়েছে? সিঙ্গুরের মানুষগুলির আম ও ছালা দুই-ই গেছে। তাদের এখন সর্বস্বান্ত অবস্থা। মাঝখান থেকে কারো কারো রাজনৈতিক বাসনা চরিতার্থ হয়েছে। এবং টাটাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ওই গাড়ি নির্মাণকারী সংস্থার বাজার পশ্চিমবঙ্গে অনেক বেড়েছে। অনেক কিছুই প্রমাণ করা যায় না। কিন্তু বোঝা যায়। তবে, এখন বোধহয় চেনা যাচ্ছে শাহিনবাগ, জামিয়া মিলিয়া, জেএনইউ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পার্কসার্কাসের বিক্ষোভের সুতোয় অন্তরাল থেকে কে টান দিচ্ছে। সম্প্রতি তদন্তে প্রকাশিত হয়েছে, ইসলামিক মৌলবাদী গোষ্ঠী পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া নাগরিকত্ব আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যেতে ১২০ কোটি টাকা ঘুষ দিয়েছে। তার ভিতরে কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলই একা ৭৪ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছেন। যাক, ঘুঘু এতদিনে ফাঁদে পড়েছে।

শাহিনবাগ

সিঙ্গুর আন্দোলনে মমতা (ফাইলচিত্র)

ফঃ ৪

আরেকবার দেশভাগ করতে চায় ফৈজুলরা

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সম্প্রতি আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের প্রাক্তন সভাপতি ফৈজুল হাসান বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন— ''মুসলমানরা ইচ্ছা করলে বিশ্বের যে কোনও দেশ গুঁড়িয়ে দিতে পারে। আমরা সেই সম্প্রদায়ের, যে সম্প্রদায় ইচ্ছে করলে যে কোনও কিছু নিমেষে গুঁড়িয়ে দিতে পারে।'' জানা গেছে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে এক ছোট্ট জমায়েতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফৈজুল হাসান বলেছেন—'১৯৪৭ সাল থেকেই এদেশে মুসলমানদের বারবার পরীক্ষা দিতে হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, ১৯৪৭ থেকে ২০২০ পর্যন্ত অনেক ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছেন ভারতীয় মুসলমানরা। আমরা ইচ্ছা করলে সবকিছু গুঁড়িয়ে দিতে পারি। আমরা কোনও দিনই ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করতে চাইনি। আমরা সেই সম্প্রদায়ের, যদি সবকিছু গুঁড়িয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি তাহলে আর রক্ষে নেই। নিমেষে সবকিছু ছারখার করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখি আমরা।' হ্যাঁ, মানতেই হবে ফৈজুল হাসানের কথা। তাঁরা এমন এক দেশে বসবাস করছেন যে দেশের অধিকাংশ রাজনীতিক শুধুমাত্র মুসলমানদের ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে তাদের সমস্ত অগণতান্ত্রিক দাবি মেনে নিয়ে তাদেরকে উচ্ছৃঙ্খল হওয়ার সুযোগ করে দেয়। তবে ফৈজুলরা যা পারেন তা সরকারি মদতে। যেখানে সরকারি মদত নেই সেখানে তাঁরা কিছুই করতে পারেন না। তিনি বলেছেন, ইচ্ছা করলে বিশ্বের যে কোনো দেশ গুঁড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু ইজরায়েলের মতো ছোট্ট একটা দেশকে আজও গুঁড়িয়ে দিতে পারেনি মুসলমানরা। বরং ইজরায়েলই পার্শ্ববর্তী মুসলমান দেশগুলিকে ঠাণ্ডা করে রেখেছে। আর এতই যদি ক্ষমতা থেকে থাকে তাহলে চীনের উইঘুর মুসলমান এবং মায়নামারের রোহিঙ্গা মুসলমানদের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওই দেশ দুটি গুঁড়িয়ে দিয়ে ক্ষমতা দেখান না কেন? আসলে তিনি খবরে ভেসে উঠতে চাইছেন। তবে মুসলমানরা যদি একটু প্রশ্রয় পায় তাহলে তারা কী করতে পারে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া হলো—

১৯৪৬ সালের ২৭-২৮ জুলাই বোম্বেতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লিগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাবের কথা অনেকেই জানেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন স্থির হয় ১৬ আগস্ট। ওই দিন জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য গোপন রাখেননি। সেদিন তিনি বলেছিলেন— ''Now the time has come for the Muslim Nation to resort to direct action. I am not prepared to discuss ethics. We have a Pistal and are in position to use it.'' অর্থাৎ ''আমাদের হাতে পিস্তল আছে, সে পিস্তল ব্যবহার করার তাকতও আছে।'' (শ্যামাপ্রসাদ : বঙ্গ বিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ, পৃ. ৮৬-৮৭)

জিন্নার সেদিনের দাবিকে সমর্থন করে বাঙ্গলার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী মি. নাজিমুদ্দিন বলেছিলেন— ''There are a hundred and one ways in which we can create difficulties, specially when we are not restricted to non-violence. The Muslim Population of Bengal know very well what Direct Action' would mean and so we need not bother to give them any lead." সংক্ষেপে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম মানে কী মুসলমানেরা জানে। (আজাদ, মর্নিং নিউজ-১১।৮।৪৬)

তাদের সেই 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর আহ্বানের পর কলকাতা, নোয়াখালি, ঢাকা, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানে ব্যাপকভাবে হিন্দু হত্যার আনন্দে মেতে উঠেছিল মুসলমানরা। আর পাকিস্তান প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে শুরু হয়েছিল হিন্দু হত্যা। ব্রিটিশ সরকারের মতে একমাত্র পঞ্জাবেই ৬ লক্ষ মানুষ নিহত হয়েছিলেন।

'...6,00,000 of them were killed. But no, not just killed. If they were children, they were Picked up by the feet and their heads smashed against the wall. If they were girls, they were raped and then their breasts were chopped off. And if they were Pregnant, they were disembowelled.' (Leonard Mosley : p. 270)

অর্থাৎ শিশুদের শূন্যে তুলে আছাড় মেরে শেষ করে দেওয়া হয়েছিল। মেয়েদের স্তন কেটে নেওয়া হয়েছিল পাশবিক অত্যাচার করার পর। আর গর্ভবতীদের গর্ভপাত করে দেওয়া হয়েছিল নৃশংসভাবে।

এছাড়া সরকারি হিসেবে নিহত— ৬,০০,০০০; গৃহহারা— ১,৪০,০০,০০০; ধর্মান্তরিত বা নিলামে যে কত মেয়েকে বিক্রি করা হয়েছিল তার কোনো সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি।

দেশভাগের পরেও ১৯৮৯ সালে কাশ্মীরে প্রায় পাঁচ লক্ষ হিন্দু পণ্ডিতকে সেখান থেকে উৎখাত করেছে তৎকালীন কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লার সরকার। তখন কয়েকজন বিদগ্ধ কাশ্মীরি পণ্ডিতকে হত্যা করা হয়েছে।

২০০২ সালে গুজরাটের গোধরা

রেলস্টেশনে নারী শিশু-সহ ৫৮ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের শাসনকাল থেকে এখনও চলছে হিন্দুদের ওপর নানাবিধ অত্যাচার। সেই অত্যাচারগুলি হয়েছে কখনো সরকারের প্রত্যক্ষ বা কখনো সরকারের পরোক্ষ সমর্থনে। আর মুসলমানদের হুংকার তো চলছেই। যেমন— ২০১৭ সালে কলকাতার টিপুসুলতান মসজিদের তৎকালীন ইমাম নূররহমান বরকতি হুংকার ছেড়ে বলেছিলেন, 'জিহাদ করব, বাঙ্গলাকে পাকিস্তান বানাবো' ইত্যাদি। এককালের কমিউনিস্ট বর্তমানে তৃণমূল বিধায়ক হাজি রেজ্জাক মোল্লা ধুয়ো তুলেছিলেন, 'ভবিষ্যতে পশ্চিমবঙ্গে একজন মুসলমান মুখ্যমন্ত্রী চাই। এটাও একটা মোলায়েম হুংকার। তারও পূর্বে হায়দরাবাদের এক বিধায়ক আকবরউদ্দিন ওয়েসি হুংকার ছেড়ে বলেছিলেন, 'সরকার মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য ক্ষমতা থেকে হাত তুলে নিক, আমরা ভারতে কী করতে পারি তা দেখিয়ে দেব। এই দৃষ্টান্তগুলি তুলে দেওয়া হলো তার কারণ যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা প্রত্যেকেই ফৈজুল হাসানের মতো মুসলমান।

দেশভাগের পর কোটি কোটি হিন্দু প্রাণভয়ে পালিয়ে এসেছেন ভারতে। এখনও সমানভাবে পাকিস্তান এবং বর্তমান বাংলাদেশে চলছে হিন্দুদের উপর অত্যাচার। এই সমস্ত অত্যাচারিত নির্যাতিত হিন্দুরা এদেশে এসেও শান্তিতে থাকতে পারছিলেন না। তাদেরকেই শান্তি প্রদানের জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনে কোথাও বলা হয়নি মুসলমানদেরকে দেশছাড়া করা হবে। অথচ এদেশেরই কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনীতিক এটাকেই বিকৃত করে মিথ্যা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে আর তাদেরই উস্কানিতে ফৈজুল হাসানের মতো প্রাক্তন ছাত্রনেতা সন্ত্রাসবাদীর মতো হুংকার ছাড়ছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যে সমস্ত মিনি পাকিস্তান তৈরি হয়ে আছে সেগুলির ব্যাপারে ভারত সরকারের চিন্তাভাবনা করা উচিত। তার সঙ্গে সঙ্গে মিনি পাকিস্তানের সমর্থকদেরও আইনের হাতে তুলে দিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে ভারত আর সন্ত্রাসীদের হাতের পুতুল সেজে থাকতে রাজি নয়।

ক্যানিং, ধুলাগড়, নদীয়া, কাশ্মীর ইত্যাদি জায়গায় যে সমস্ত হিন্দুদের ধন-সম্পদ লুঠ করে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে তারা কিন্তু সকলেই বিজেপি সমর্থক ছিল না। সেখানে যেমন ছিল বিজেপি সমর্থক, তেমনি কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল সমর্থকও। জেহাদিরা রাজনৈতিক পরিচয় দেখে মারবে না, মারবে হিন্দু। যেমন মারছে বাংলাদেশে-পাকিস্তানে।

শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের ভেবে দেখা প্রয়োজন যে, ক্যানিং, ধুলাগড়, নদীয়া, কাশ্মীর ইত্যাদি জায়গায় যে সমস্ত হিন্দুদের ধন-সম্পদ লুঠ করে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছিল তাদের কথা। তারা কিন্তু সকলেই বিজেপি সমর্থক ছিল না। সেখানে যেমন ছিল বিজেপি সমর্থক তেমনি ছিল কংগ্রেস, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থকও। জেহাদিরা রাজনৈতিক পরিচয় দেখে মারবে না, তারা মারবে শুধু হিন্দু। যেমন মারছে বাংলাদেশে-পাকিস্তানে।

আমি আবার পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র ভারতবাসীকে অনুরোধ করি তারা শীতঘুম ভেঙে জেগে উঠুন। আর কত ঘুমোবেন। আপনি কী চান না আপনার অত্যন্ত আদরের এবং প্রাণের পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনিরা এই দেশে শান্তিতে বসবাস করুক? ধর্মনিরপেক্ষতার চশমায় নয়, ভালো করে ভেবে দেখুন একজন হিন্দু হিসেবে। ভেবে দেখুন— পাকিস্তান, বাংলাদেশের হিন্দুদের কথা, ভাবুন কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কথা, ভাবুন পশ্চিমবঙ্গের ক্যানিং, ধুলাগড়, দেগঙ্গা, বাসন্তী, কালিয়াচকের কথা। এমনিতে অনেক দেরি হয়ে গেছে, আর নয়। উঠুন, জাগুন, পরিস্থিতি অনুধাবন করুন। পরামর্শ আমার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার আপনার। ■

উত্তরবঙ্গে দুর্গাবাহিনীর জেলা সম্মেলন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাংগঠনিক আয়াম দুর্গাবাহিনী মাতৃশক্তির জেলানুসারে সম্মেলন চলছে। গত ২৪ জানুয়ারি পশ্চিম কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা শহরের ঠাকুর

পঞ্চানন মোড়ের আশা ভবনে, ২৫ জানুয়ারি কোচবিহার শহরের বিবেক তীর্থে এবং ২৬ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার শহরের মহাকাল ধাম মন্দিরে জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৫০০ জন মা-বোন অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্রীয় মাতৃশক্তি প্রমুখ শ্রীমতী সংগীতা গোখলে, মহিলা থানার মহিলা পুলিশ অফিসার, প্রান্তীয় দুর্গাবাহিনী ও মাতৃশক্তি প্রভারী শ্রীমতী বিভা সরকার, প্রান্তীয় মাতৃশক্তি প্রমুখ দীপ্তি দাস, প্রান্তীয় দুর্গাবহিনী প্রমুখ শ্রীমতী সরস্বতী। মা-বোনেদের ওপর নানা রকম অত্যাচার ও লাঞ্ছনা এবং লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে সচেতনতামূলক শোভাযাত্রা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

পুরুলিয়ায় সচেতন নাগরিক মঞ্চের সভা

গত ২৬ জানুয়ারি সচেতন নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে পুরুলিয়া শহরের হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের জগদীশ হলে এক নাগরিক সভার আয়োজন করা হয়। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা সমাজসেবী ড. তিলক রঞ্জন বেরা প্রদীপ প্রজ্বলন করে সভার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিবেকানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গৌতম মুখোপাধ্যায়, পার্থ গাঙগুলি, বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজলবরণ সিংহ, অরুণ সিংহ, তড়িৎ মাহাত প্রমুখ। সভা পরিচালনা করন শিক্ষক অম্বুজ তেওয়ারী। সভায় ৩০০ জন প্রবুদ্ধ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সভা থেকে শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানানো হয়।

সিউড়ীতে তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

গত ২৬ জানুয়ারি বীরভূম জেলার হাটজনবাজারে সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে 'স্মৃতির আলোকে আজও তারাশঙ্কর' এবং 'বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' বিষয় দুটির আলোচনা-সহ কবিতা ও গল্প পাঠ হয়।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিচারপতি বিপিন মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক তারাশঙ্কর-পৌত্র ও গল্পকার সৌম্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, কবি কুন্তল রুদ্র ও আশিস মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যক্ষ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়। তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজের সম্পাদক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় বলেন, প্রাচীন দুই মহাকাব্য থেকে শুরু করে তারাশঙ্কর পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য রচনার যে ধারা সেই ধারাকে আধুনিকতার পরিভাষায় জাতীয়তাবাদী সাহিত্যচর্চার ধারা বলেই অভিহিত করা হয়। চিরায়ত সাহিত্যচর্চার এই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে 'তারাশঙ্কর স্মৃতি সাহিত্য সমাজ' বীরভূম জেলার সাহিত্য উন্নয়নের সংকল্প নিয়েছে। জাতীয়তাবাদী কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার আদর্শ।

‘দ্য লাইট অব এশিয়া’য় উদ্ভাসিত শাক্যমুনির জীবন

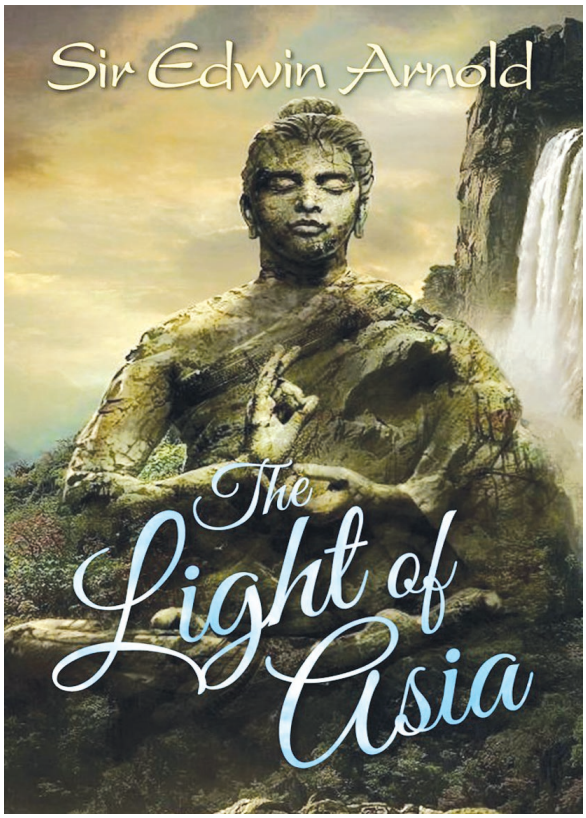

কৌশিক রায়

ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রতিভাদের নিয়ে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা বিমুগ্ধ চিত্তে অনেকবারই কলম ধরেছেন। সেই সূত্র ধরেই এদেশীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পুণ্য বৈশিষ্ট্যগুলির মেলবন্ধনের জন্য ভগবদগীতার অনুবাদ করেছিলেন এশিয়াটিক সোসাইটির চার্লস উইলকিন্‌স। ভারত ও এশীয় সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ওই প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম প্রাণপুরুষ জেমস প্রিন্সেপ ব্রাহ্মী ও খরোষ্ঠী লিপির মর্মোদ্ধার না করলে ‘দেবানায় পিয়, পিয়দস্‌সী’ প্রজারঞ্জক সম্রাট অশোকের মানবহিতৈষণা আমাদের কাছে হয়তো অধরাই থেকে যেতো। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সংস্থার প্রাণপ্রতিষ্ঠাতা— স্যার আলেকজান্ডার কানিংহাম লিখেছেন শিখজাতির ইতিহাস— যা থেকে আমরা গুরু নানকদেবের ধর্মভাবনা এবং বিজাতীয় মোগলদের বিরুদ্ধে গুরু গোবিন্দ সিংহের তেজস্বী বীরত্বের পরিচয় পাই। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনী নিয়ে নোবেল সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ী ফরাসি সাহিত্যিক— রম্যাঁ রলাঁ-র লেখা গ্রন্থ— ‘Le Sevle Enchantee’ (পবিত্রাত্মা) তো বিশ্ব সাহিত্যের এক অন্যতম মাইলফলক হয়ে রয়েছে। হিমালয় পর্বতের দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে নেপাল এবং রাজা বিম্বিসার ও রাজা অজাতশত্রু-শাসিত ভারতবর্ষের সারনাথ মগধ-রাজগৃহ-কুশীনগর-শ্রাবস্তীর মাটিতে মানবপ্রেম, অহিংসা এবং সাম্যবাদের বাণী ছড়িয়ে দেওয়া, কপিলাবস্তুর রাজকুমার শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ ও তদানীন্তন সমাজকে উপজীব্য করে ‘Siddhartha’ নামক একটি অসাধারণ উপন্যাস উপহার দিয়েছিলেন নোবেল-জয়ী এক অস্ট্রীয় লেখক হেরমান হেস। তবে গৌতম বুদ্ধের জীবন ও ধর্মময় কর্মকাণ্ডকে নিয়ে আটটি খণ্ডে, অমিতত্রাক্ষর ছন্দে (Blank Verse) 'The Light of Asia' নামে যে মহাগ্রন্থটি আমাদের উপহার দিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের গ্রেভস্যান্ডে ১৮৩২ সালে জন্মানো ঋষিতুল্য এবং ভারতপ্রেমী সাহিত্যিক স্যার এডউইন আর্নল্ড, সেটি বৌদ্ধ দর্শন এবং সুপ্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যকে জানার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে একটি চিরকালীন অনুপ্রেরণা। আচার্য রামচরণ শুক্লার দ্বারা এডউইন আর্নল্ড-এর এই ‘লাইট অব এশিয়া’ বা ‘এশিয়া মহাদেশের আলোকপ্রভা তথাগত’ বইটি হিন্দি ভাষায় অনুদিত হওয়ার ফলে ‘অষ্টাঙ্গিক মার্গ’-এর প্রদর্শক এবং ‘মহাবোধি জ্ঞান’ লাভের দিশারির প্রতি সাধারণ ভারতীয় জনমানসের আগ্রহ আরও বেড়ে যায়।

বার্মিংহামের কিং এডওয়ার্ড’স স্কুলের শিক্ষক এবং মহারাষ্ট্রের পুনেতে গভর্নমেন্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ স্যার এডউইন আর্নল্ড কবিতা লেখার প্রতি আগ্রহী হলেও ‘দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ’ এবং ‘দ্য নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড’ সংবাদপত্র দুটিতে ভারত ও এশিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবেদনের মাধ্যমেই তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু করেছিলেন। জাপানি জীবনচর্যা নিয়ে ‘The Tenth Muse’ এবং নাটক— ‘Adzvma’, ইসলাম নিয়ে ‘Pearts of Faith’ এবং খ্রিস্টধর্ম নিয়ে ‘The Light of The World’ কাব্যগ্রন্থগুলি লিখেছিলেন স্যার আর্নল্ড। তবে সেগুলির কোনওটিই জনপ্রিয় হয়নি। ‘দ্য লাইট অব এশিয়া’র মাধ্যমে লুম্বিনী উদ্যানে শাক্যরাজ শুদ্ধোদন ও রানি মায়াদেবীর পুত্ররূপে জন্মলাভের পর কপিলাবস্তুতে বড়ো হয়ে ওঠা, যশোধরার পাণিগ্রহণ, সারনাথের মৃগশিখাবনে ধর্মচক্রপ্রবর্তন, নৃপতি বিম্বিসারকে দীক্ষাদান এবং বিহারের কুশীনগরে ইহলীলা সংবরণ পর্যন্ত গৌতম বুদ্ধ-র কর্মময় জীবনের আলেখ্য রচনা করে স্যার এডউইন আর্নল্ড যেন ভারতের ঐতিহ্যকুম্ভের পুণ্যসলিলে অবগাহন করলেন। গ্রন্থটির মুখবন্ধে গৌতম বুদ্ধের সশ্রদ্ধ বন্দনা করে স্যার এডউইন আর্নল্ড লিখেছেন— ‘‘More than a third of Mankind...own their moral and religious ideas to this illustrious prince, whose personality...cannot but appear the highest, gentlest, holiest and beneficent.” ভারতবিদ বা ইন্ডোলজিস্ট স্যার ফ্রিডরিখ ম্যাক্স ম্যুলারের কথার প্রতিধ্বনি করেই স্যার এডউন আর্নল্ড মন্তব্য করেছেন— এই বিশ্বের যাবতীয় দুর্নীতি, রিপু, সন্ত্রাস ও কর্মবিমুখতা, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে একটি অমোঘ অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে শাক্যমুনি

বুদ্ধ কথিত 'ত্রিপিটক'-এ গ্রন্থিত বাণীগুলি।

'দ্য লাইট অব এশিয়া'র কিছুটা সমালোচনা হয়েছেই। অনেক সাহিত্য-সমালোচক বলেছেন— গ্রন্থটিতে অনেক বেশি কাব্য অলংকার এবং অতিশয়োক্তি প্রয়োগ করেছেন এডউইন আর্নল্ড। আবার অনেকের মতে— আর্নল্ড অনেক স্থানেই অহেতুক ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে যিশুখ্রিস্টের তুলনা করেছেন— যদিও দুজনেই অহিংস মানবধর্মের যুগপ্রবর্তক। তবে, 'লাইট অব এশিয়া' গ্রন্থটিতে এডউইন আর্নল্ড যে ভগবান বুদ্ধকে ভারত-আত্মার ঐতিহ্যবাহী বাণীমূর্তি হিসেবেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন, সেটি বুদ্ধদেবের প্রতি তাঁর আকুল আর্তির মাধ্যমেই বুঝতে পারা যায়। আর এখানেই তথাগত বন্দনায় দ্য লাইট অব এশিয়ার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য— 'চণ্ডালিকা'-তে অন্ত্যজ-তনয়া প্রকৃতির বুদ্ধস্তুতি এবং অশ্বঘোষের সংস্কৃত কাব্য 'বুদ্ধচরিতম'—

''Ah ! Blessed Lord ! Oh, High Deliverer !
Ah ! Lover ! Brother ! Guide ! Lamp of the law!
...Rise, Great Sun !
And list my leaf and mix me with the wave.
Om Mani Padme Hum, the Sunrise Comes !"

বর্তমান নশ্বর জগৎ সংসারে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ষড়রিপুর অসুরেরা। বৌদ্ধশাস্ত্রে এদেরকেই বলা হয় অন্ধকার জগতের অধিপতি— 'মার'-এর অনুচর। বিহারের বুদ্ধগয়া, উরুবিল্ব (উরবেল) গ্রাম এবং নৈরঞ্জনা (লীলাজান) নদীতীরে কঠোর তপস্যা করে দিব্যজ্ঞান লাভের সময় রাজকুমার সিদ্ধার্থও নিঃশঙ্ক ও নির্ভয়চিত্তে এই 'মার' এবং তার অনুচরদের বিরুদ্ধে অহিংস, মানসিক প্রতিরোধ গড়ে তুলেই ভগবান বুদ্ধে পরিণত হন। স্যার এডউইন আর্নল্ড বুদ্ধদেবের সেই প্রশান্ত মানসিকতার বর্ণনা করে আমাদের শিখিয়েছেন— প্রত্যহ আমাদের জীবনে ঘটতে থাকা বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয়। এই প্রবল মানসিক শক্তি থাকলে শাক্যমুনির মতো আমরাও যে নশ্বর জীবনে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে চূড়ান্ত জ্ঞান লাভ করতে পারি— তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন স্যার এডউইন আর্নল্ড—

''Our Lord (Buddha) attained Abhidjna
Blessed NIRVANA–Sinless, Sinless rest
That change which never changes."

প্রিয় সারথি ছন্দকের সঙ্গে বিলাসবহুল রাজপ্রাসাদের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে, বাইরের দুনিয়াতে অস্কার ওয়াইল্ড-এর 'The Happy Prince'-এর মতোই সাধারণ মানুষের অবর্ণনীয় রোগ-ব্যাধির কষ্ট, মৃত্যু ও জরাগ্রস্ত জীবনের জ্বালাকে বিস্ময়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেন রাজকুমার সিদ্ধার্থ। স্যার আর্নল্ড-এর কাব্যিক ছন্দে বির্মূত হয়েছে তাঁর সেই অসহ্য উপলব্ধিটি, যার থেকে ভবিষ্যতে তিনি মানবজাতিকে মোক্ষলাভের পথ দেখাবেন। স্ত্রী যশোধরাকে (গোপা) তখন শাক্যমুনি শোনালেন মানুষের করুণ পরিণতি সম্পর্কে তাঁর গভীর আত্মোপলব্ধির কথা—

''And we shall both grow old, Yasodhara !
Loveless, unlovely, weak, and old, and bowed.
This have I found,
And all my heart is darkened with its ...dread."
Seeking to save the sad Earth I have seen."

গৌতম বুদ্ধ কখনোই বলেননি— ঈশ্বরবন্দনা করতে হলে সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে বিচ্যুত হয়ে থাকতে হবে। স্যার এডউইন আর্নল্ড তাই দেখিয়েছেন— পত্নী যশোধরার অনুরোধে পুত্র রাহুলকে সঙ্ঘের অন্যতম শ্রমণ হিসেবে দীক্ষিত করে ভগবান বুদ্ধ সেই পিতৃদায়ই রক্ষা করেছিলেন। বিশ্বকবির মতোই সারিপুত্ত-অনাথপিণ্ডদ -মৌদগল্যায়ন-আনন্দ-উপালির ধর্মগুরু যেন তাঁর আশি বছরের সুদীর্ঘ, কর্মময় জীবনের মাধ্যমে বলতে চেয়েছিলেন— ''বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়/অসংখ্য বন্ধন মাঝে/লভিব মুক্তির স্বাদ।" তাই স্যার আর্নল্ড-এর বুদ্ধদেব গার্হস্থ্য জীবনে অনুসৃতব্য 'মধ্যম পন্থা' বা সরল তাপস জীবনের উদ্ভাবক। 'দ্য লাইট অব এশিয়া'তেও রাজা অজাতশত্রু এবং পিতা শুদ্ধোদনকে উপদেশরত গৌতম বুদ্ধ যেন প্রতিধ্বনি করেছেন গীতাতে উল্লিখিত সুদর্শন চক্রধারী কৃষ্ণ বাসুদেবের সেই অমোঘ বাণীটিই— ''চক্রবৎ পরিবর্তন্তে সুখানি চ দুঃখানি চ"।

''Only, while turns this wheel invisible,
No pause, no peace, no staying place can be who mounts will fall, who falls may mount; the spokes
Go round unceasingly !

ভাগ্যচক্রের এই অবিরাম আবর্তন অসহায় মানবকদের পিষ্ট হতে দেখেই হয়তো শ্রীরামকৃষ্ণ পরিহাস করে বলেছিলেন স্বামীজীকে— ''বুঝলি লরেন ! এই সংসারটি হলো ধোঁকার টাটি।" 'দ্য লাইট অব এশিয়া' কাব্যে তথাগত বুদ্ধদেবের জীবন দর্শন ব্যাখ্যার জন্য স্যার এডউইন আর্নল্ড যে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার দ্বারা অনেকাংশেই উপকৃত হয়েছিলেন, সেটি 'দিব্যগীতি' বা 'The Song Celestial' নামক দীর্ঘ কবিতাটির মাধ্যমে তিনি বুঝিয়েও দিয়েছেন। তাঁর নিজের দাম্পত্যজীবনে বারংবার এসেছে মৃত্যুর কশাঘাত। প্রথম দুই স্ত্রী— ক্যাথরিন এলিজাবেথ আর জেনি ক্যানিংয়ের অকালমৃত্যু হয়। তখন আরও বেশি করে ভারতীয় তথা এশীয় অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন শোকাহত স্যার আর্নল্ড। জাপানি তৃতীয়া স্ত্রী তামা ক্যুরোকাওয়ার উৎসাহে স্যার আর্নল্ড আরও বেশি করে 'ত্রিপিটক' ও গীতাপাঠের প্রতি আকৃষ্ট হন। স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো বক্তৃতাও তাঁকে সম্মোহিত করে। শ্রমণ অঙ্গারিকা ধর্মপালের সাহায্যে স্যার এডউইন আর্নল্ড কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে ভারতের অন্যতম বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম— মহাবোধি সোসাইটিরও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। 'দ্য লাইট অব এশিয়া'-র মাধ্যমে ভারতের চিরায়ত, আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন স্যার এডউইন আর্নল্ড। তিনি নিজেই বলেছেন— বৌদ্ধধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে বুঝতে পারার জন্য তাঁর পাশ্চাত্য মানসিকতা ভারতীয় দর্শনকে গভীরভাবে পাঠ করার চেষ্টা করেছে— ''The views, however, here indicated of 'Nirvana', 'Dharma', 'Karma' and the other chief features of Buddhism, are at least the fruits of considerable study." সাগরপারের ভূখণ্ডে ভারতীয় সংস্কৃতির ধর্মীয় পরম্পরা যে কতটা সম্মোহনী ছিল, তারই এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ— 'The Light Of Asia.'

কলা বউ কার বউ?

দিলীপ পাল

কলা বউ, কার বউ? কমবেশি সবাই জানি যে, কার আবার, গণেশের! বহুকাল থেকেই এমনটাই চলে আসছে। দুর্গা প্রতিমার সঙ্গে যুক্ত গণেশের পাশে দীর্ঘ ঘোমটা টানা ছোটো একটি কলাগাছকে দেখে শিশু-বালক-বালিকারা মুখে মুখে উচ্চারণ করে থাকে এই প্রশ্ন। তার জবাবে ওই একই কথা। কিন্তু তারপরও যখন প্রশ্ন ওঠে, গণেশেরই ডান দিকে থাকে কেন কলা বউটি? বাঁদিকে কেন থাকে না? তখনই আমাদের হোঁচট খেতে হয়। একটু তোতলাতে তোতলাতে বলতে হয়, ওই ঠাকুর দেবতাদের ব্যাপার কিনা, তাই বোধহয়...। তাহলে অন্যদের বেলায় নয় কেন? সীতা কেন থাকে রামের বাঁদিকে, হর-পার্বতীর হর কিংবা লক্ষ্মী নারায়ণের নারায়ণ কেন দাঁড়ান পার্বতী লক্ষ্মীর ডান দিকে? এইসব প্রশ্নের মধ্যেই কেউ হয়তো এগিয়ে এসে বলবেন, না, না, কলা বউ গণেশের বউ নয়, ওটা হলো নবপত্রিকা। ধন্ধ আরও বাড়তে থাকে। নবপত্রিকা? সেটা আবার কী জিনিস? ওটা কি নতুন কোনো পত্রিকা? না, না, পত্রিকা হতে যাবে কেন? নব মানে এখানে নতুন নয়, নব মানে হলো নবম সংখ্যা। অর্থাৎ নয়, আর পত্রিকা হলো ভেষজ গাছ। তারপরও আছে আরও বহু কেন। সেই কেন'র উত্তর খুঁজতেই হাতড়াতে হয় নানা পুরাণ। সেইসব পুঁথি ঘেঁটেই জানা যায় এই কলাবউ অথবা নবপত্রিকার রহস্যটা।

পৌরাণিক মতে পরমা প্রকৃতি দেবী ন'টি রূপে অবস্থান করেন ন'টি ভেষজ বা গাছে। এই ন'টি ভেষজ গাছ বা গাছগুলি হলো যথাক্রমে— (১) কলা, (২) কচু, (৩) হলুদ, (৪) জয়ন্তী, (৫) বেল, (৬) ডালিম, (৭) অশোক, (৮) মানকচু এবং (৯) ধান। এই ন'টি গাছের মধ্যে কলাতে অবস্থান করে থাকেন ব্রাহ্মণী, কচুতে কালিকা, হলুদে দুর্গা, জয়ন্তীতে কার্তিকী, বেলে শিবা, ডালিমে রক্তদন্তিকা, অশোকে শোকরহিতা, মানকচুতে চামুণ্ডা এবং ধানে অবস্থান করেন লক্ষ্মী। পুরাণকাররা বলেন, পরমা প্রকৃতিদেবী মহামায়া শুধু একবারই মহিষাসুরকে বধ করার জন্য আবির্ভূত হননি, তিনি বিভিন্ন কল্পে বিভিন্ন যুগে মহিষাসুরের মতনই ধর্মদ্রোহী অসুর বা অশুভ শক্তিকে বিনাশ করার জন্য বিভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হন। এই ভাবেই শুম্ভ-নিশুম্ভ'র সঙ্গে দেবীর সেই মহাসমরের সময় দেবী সৃষ্টি করেছিলেন অষ্ট নায়িকা। তাঁরা শুম্ভ-নিশুম্ভের সমস্ত সৈন্যকে বিনষ্ট করে ওই দু'জনকে বধ করেন। দেবী মহামায়া-সহ এই নব বা ন'টি শক্তিরই প্রতীক হলো এই নব পত্রিকা। এই নবপত্রিকাকেই বলা হয়ে থাকে কলাবউ। দেবী যে অষ্ট নায়িকার সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের নামগুলি যথাক্রমে— (১) ব্রাহ্মণী, (২) মাহেশ্বরী, (৩) বৈষ্ণবী, (৪) বারাহী, (৫) নারসিংহী, (৬) কৌমারী, (৭) ঐন্দ্রী এবং (৮) চামুণ্ডা। কিন্তু নবপত্রিকার অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে দুর্গা ছাড়াও আর যে আটজনের নাম পাওয়া যায়, তাতে বারাহী, নরসিংহী এবং ঐন্দ্রীর নাম তালিকার মধ্যে নেই। পরিবর্তে আছে কালিকা, রক্তদন্তিকা এবং শোকাহরিতা'র।

এই যে কলাবউ, যা আসলে নবপত্রিকা বা ন'টি শক্তির প্রতীক, তার আরেকটি নাম 'কুলবৃক্ষ'। শক্তানন্দ তরঙ্গিণী গ্রন্থের মতে, যোগিনীরা সবসময়ই এই কুলবৃক্ষে বাস করেন। তন্ত্রশাস্ত্রে এই কুল বৃক্ষকে আবার বলা হয় কল্পবৃক্ষ। এখানে বলা হয়, এই কল্পবৃক্ষে বাস করেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। এই যে দেবী শক্তির প্রতীক নবপত্রিকা, তা মহাসপ্তমীর দিন গঙ্গা, নদী এবং পুকুরে স্নান করিয়ে পূজামণ্ডপে এনে দেবীমূর্তির সঙ্গে গণেশের ডানদিকে রাখা হয়। আর তাই শিশু অথবা সাধারণ মানুষের কাছে কলাবউ নামে পরিচিত হয়ে আছে। ■

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road. Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556. Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

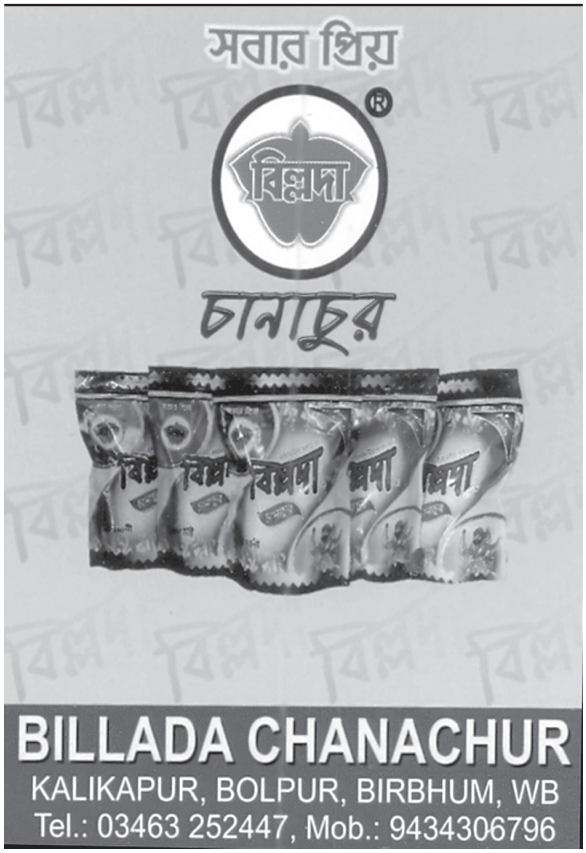

মূল্যবোধের অবক্ষয় পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক

ড. রতন কুমার ঘোষাল

এ কথা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষ বিশ্বের সমস্ত দেশগুলির মধ্যে একটি অন্যতম গণতান্ত্রিক দেশ, যে দেশটি ভৌগোলিক, জাতিগত, ধর্মগত, ভাষাগত, বৈচিত্র্য সত্ত্বেও তার গণতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ধরে রেখেছে। এটাও সত্য যে, পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশের তুলনায় ভারতে মাথাপিছু আয়ও অনেক কম এবং মানব উন্নয়ন সূচকে ভারতের স্থান অনেক নীচে। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিকাঠামো প্রভৃতির দিক থেকেও উন্নত বলা যায় না। প্রায় ১৩০ কোটি ভারতবাসীর এক বিপুল অংশের দারিদ্র্য মুক্তিও হয়নি, তথাপি গণতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের অন্যতম দিক অর্থাৎ সময়মতো নির্বাচনপর্ব সম্পন্ন করাতে ভারতবর্ষ খুবই দক্ষ। স্বভাবতই পর্যায়ক্রমে ভারতের সপ্তদশ লোকসভার নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পর বিজেপি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে বলিষ্ঠ, প্রাজ্ঞ এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জননেতা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সরকার গঠন করেছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভারতে গণতন্ত্রের প্রকৃতি এত দ্রুত বদলে যাচ্ছে যে গণতন্ত্রে বহুদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব বা বিরোধী দলের অস্তিত্বের বিনাশ ঘটানোই যেন ভোটযুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ গণতন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে যেনতনপ্রকারে কার্যকরী অধিকার প্রতিষ্ঠা করার হাতিয়ার রূপে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ যেন একটা অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতাসীন দল ক্ষমতায় থাকবে বা অন্য কোনো দল ক্ষমতায় আসবে তা জনগণ তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থাৎ ভোটদানের মাধ্যমে ঠিক করবে। এই নির্বাচন প্রক্রিয়া একই সঙ্গে ভারতের সমস্ত রাজ্য ও অঙ্গরাজ্যগুলিতেও চলেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যে এ ধরনের খুন, জখম, দাঙ্গা, বুথ দখল, ভোট দিতে না দেওয়া, বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের বুথে বসতে না দেওয়া, হুমকি দেওয়া, প্রার্থীকে প্রহার, প্রার্থীর গাড়ি ভাঙচুর প্রভৃতি দেখা যায় না। এককথায় অন্য কোনও রাজ্যে অরাজকতা ও দাঙ্গা তথা দুর্বৃত্তায়ন ভোটের আগে, ভোটের সময়ে ও পরে হয়নি বা অন্য কোনো রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীরও প্রয়োজন হয়নি।

রাজ্যপালকে কালো পতাকা দেখিয়ে বিক্ষোভ।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে কেন? কিছুদিন আগে টিভির পর্দায় এক মন্ত্রীমহাশয়কে বলতে শুনলাম পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ভীষণভাবে রাজনীতি সচেতন। এ ঘটনাগুলি তারই অভিব্যক্তি। আমার প্রশ্ন, এসব কি মানুষের চেতনশক্তি থাকলে ঘটতে পারে? চেতনাশক্তির অভিব্যক্তি তো সমত্ব বা একত্ববোধ। তবে আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিবিদরা ও তাদের অনুগামীরা রাজনীতিকে পূর্ণ মাত্রায় পেশা হিসেবে ও ব্যবসায়িক বিনিয়োগের জায়গা হিসাবে বেছে নিয়েছেন বলেই পেশাচ্যুত, কর্মচ্যুত ও অন্নচ্যুত, প্রতিপত্তিচ্যুত হওয়ার ভয়ের অভিব্যক্তি হলো এই রাজনৈতিক অরাজকতা। সেজন্য প্রতিপক্ষ বা বিরোধী দলগুলি যাতে তাদের পেশা-সাম্রাজ্যে থাবা বসাতে না পারে এসব তার প্রচেষ্টা। এজন্যই সম্ভবত অশ্লীল ও কুভাষা প্রয়োগ যেন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির অন্যতম একটা রীতি বা নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঠিক একই চিত্র দেখা গিয়েছিল ২০১১ সালের পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় প্রাক্‌কালে। প্রয়াত সিপিএম নেতা অনিল বসুর, বিনয় কোঙারের অশ্লীল ভাষা ও অঙ্গভঙ্গিমা যা তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেই অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত আজ বহন করে চলেছেন নেত্রী স্বয়ং। অর্থাৎ সেই ট্রাডিশন আজও সমানে চলেছে এবং এখন শুধু ভোটযুদ্ধে নয়, সাধারণ অবস্থাতেও বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর কিছু কিছু ভাষা বড়ো বেদনাদায়ক। সরকারি কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মীরা ডি. এ চাইলে উনি বলেছিলেন 'ঘেউ ঘেউ করবেন না'। সরকারি অফিসারদের যাদের যোগ্যতা অবশ্যই তাঁর থেকে অনেক বেশি তাদেরও তিনি 'চাবকে সোজা করে দেওয়া উচিত' বলতে দ্বিধা করেননি। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর গালে থাপ্পড় দেওয়ার কথা, কান ধরে উঠ-বোস করানোর চ্যালেঞ্জ জানানো থেকে প্রধানমন্ত্রী মিথ্যাবাদী, গুন্ডা, চোর, তুইতোকারি ইত্যাদি ভাষার প্রয়োগ যিনি করেন, তাঁর নিজ সম্মানবোধের অভাবকেই তা পরিস্ফুট করে। এগুলি রাজনৈতিক দৈন্যদশাকেই প্রকাশ করে ও বাঙ্গালিয়ানার গর্বকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর বাঙ্গালিয়ানা, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে একদা শ্রেষ্ঠত্বের গর্ব সত্তরের দশক থেকে নিম্নগামী হতে হতে বর্তমানে একেবারে যে তলানিতে চলে গেছে তা বোধহয় বলার

ফঃ ৫

অপেক্ষা রাখে না। পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক, গণতান্ত্রিক, শিক্ষা, সংস্কৃতিক পরিবেশ ও অবস্থা যে অতিমাত্রায় কলুষিত হয়ে গেছে তা আজ ভোট বলে নয়, ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার অনেক আগে থেকেই প্রবল হয়ে ওঠে। কারণ দৈনিক সংবাদপত্র বা টিভি খুললেই দেখা যায় প্রকাশ্য দিবালোকে জনবহুল এলাকায় হয় খুন, গণধর্ষণ, শুটআউট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তোলাবাজি ইত্যাদি। এমনকী সরস্বতী পূজোর সময়ের সান্ধ্যসভা চলাকালীন বিধানসভার সদস্যও শুটআউটের হাত থেকে রেহাই পাননি।

অতি সম্প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রতিকৃতি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাঁশ ও লাঠি পেটার হাত থেকেও রেহাই পায়নি। বিদ্যাসাগর বেঁচে থাকলে হয়তো স্বভাবসুলভ ভাবেই বলতেন 'কই আমি তো এদের কোনো উপকার করেছি বলে মনে পড়ে না।' নকশাল আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং মনীষীদের প্রতিকৃতি ভাঙচুর, খুন, ট্রাম-বাস পোড়ানো, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দিকে চায়ের ভাঁড় নিক্ষেপ, পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের সাজানো বাগান শুকিয়ে দেওয়া প্রভৃতি থেকে শুরু করে বর্তমান শাসকদলের বিধানসভাতেও তাণ্ডব ও ভাঙচুর, প্রেসিডেন্সি কলেজের বেকার ল্যাবরেটরিতে ভাঙচুর, পুলিশ অফিসারের জন্য ফুটপাতে মুখ্যমন্ত্রীর ধরনা, বিধান সভার ক্যাবিনেট মিটিংকে ফুটপাতে নিয়ে আসা, আনুগত্যের নিরিখে অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে কলেজ অধ্যক্ষদের উপাচার্য ও সহউপচার্য হিসেবে নিয়োগ করা (যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপক হওয়া দরকার), কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, উপাচার্যদের দীর্ঘকাল ঘেরাও করে রেখে অসুস্থ করে দেওয়া— এ সবই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির প্রকৃতি ও নীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আসলে রাজনীতিতে অতিমাত্রায় দুর্বৃত্তায়ন ও আনুগত্য এবং পদলেহনের ফলেই পশ্চিমবঙ্গের এই রাজনৈতিক, সামাজিক অরাজকতা।

শুধু পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি কেন, পূর্বতন সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী বেশ কিছুদিন আগে থেকেই র‍্যাফাল ইস্যুতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীজীকে চোর ও মিথ্যাবাদী উপাধিতে ভূষিত করেছেন। সম্প্রতি তিনি প্রধানমন্ত্রীকে মোদীলাই বলেছেন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বোফর্স কেলেঙ্কারির কথা তুলেছেন কিন্তু দীর্ঘদিন সংযত থাকার পর তিনি অতিসম্প্রতি রাজীব গান্ধীকে ভ্রষ্টাচারী বলেছেন বা বলতে বাধ্য হয়েছেন। তাতে পশ্চিমবঙ্গের কিছু বুদ্ধিজীবীর বড়োই গাত্রদাহ। অথচ মুখ্যমন্ত্রীর 'ঘেউ ঘেউ করবেন না', 'চাবকে সোজা করা উচিত', 'মোদীর গালে থাপ্পড়, প্রধানমন্ত্রীকে তুই তোকারি সম্বোধন প্রভৃতি উক্তিতে ও বিধানসভার সদস্যের শুটআউটে তাঁরা নীরব। আহা আনুগত্য ও পদলেহনের কী প্রকৃতি! রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর প্রতি এই সমস্ত কুভাষার প্রয়োগ ও আচরণ থেকে এবং কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধীর মন্তব্য থেকে বর্তমান প্রজন্ম বিশেষত যুব প্রজন্ম শিক্ষা নিলে রাজ্যের তথা দেশের সামাজিক ও সংস্কৃতির অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? একথা রাজনীতিবিদদের মনে রাখা উচিত যে তাঁদের বক্তব্য ও আচরণ ইতিহাস হয়ে থাকবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এর থেকে শিক্ষা নেবে। এতে বঙ্গ তথা ভারতের সংস্কৃতি, সমাজ ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের পথে যাবে। অথচ এই নেতা-নেত্রীরাই কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজী, নেতাজী, গান্ধীজীর কথা বলেন। আসলে আমরা কথায় কথায় স্বামীজী, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীরামকৃষ্ণ, নেতাজীর কথা বলি বটে কিন্তু তাঁদের থেকে শিক্ষা নিয়ে বাস্তবে প্রয়োগ করি না। সেজন্য স্বামীজী ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতির উন্নতির জন্য বারবার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রকৃত শিক্ষার উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ভারতের শিশুরা নেতিবাচক শিক্ষা পাচ্ছে। অর্থাৎ তাদের মধ্যে শ্রদ্ধার (যা বেদ-বেদান্তের মূলকথা) অভাব সৃষ্টি করছে। তিনি মনে করতেন একমাত্র প্রকৃত শিক্ষাই মানুষের মধ্যে অন্তর্নিহিত ব্রহ্মশক্তিকে জাগরিত করতে পারে এবং সেখান থেকেই মানুষের মধ্যে কর্মশক্তি, ভালোবাসা, ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, স্বাধীন চেতনা জাগরিত হবে। তাই তিনি বলেছেন—"There is no other way to salvation excepting the power of spirituality", 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহন্যায়'।

স্বামীজী শিকাগো থেকে ১৮৯৪ সালে দেওয়ানজীকে একটি চিঠিতে লিখেছেন ভারতবাসীর দীর্ঘ দিনের দাসত্ব তাঁদের মধ্যে ভয়ংকর হিংসাত্মক ও সন্দেহবাতিক মনোভাব সৃষ্টি করে দিয়েছে। এটাকে তিনি ভারতবাসীর পশ্চাদ্‌পদতার মূল কারণ বলেছেন। তিনি আরও লিখেছেন, 'ভারতে তিনজন ব্যক্তি একত্রে পাঁচ মিনিটের জন্য কাজ করতে পারে না। প্রত্যেকে ক্ষমতার জন্য লড়াই করে এবং পরিণামে সমগ্র সংঘটন দুঃখের মধ্যে পড়ে, হে ঈশ্বর কখন আমরা শিখব ঈর্ষান্বিত না হতে।' আমার মনে হয় স্বামীজীর এই উক্তি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে বর্তমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সঠিকভাবে প্রাণিধানযোগ্য।

যাঁরা কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের নাম আওড়ান আমার ধারণা তাঁরা জানেন না যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি লেখায় প্রথম লাইনটাই শুরু করেছেন এই বলে 'মানুষের সভ্যতা হচ্ছে আচরণের সৌন্দর্য। এর জন্য ধৈর্য, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিশ্রামের পরিবেশ দরকার। সত্যিকারের সভ্যতা ও ভদ্রতা ছবি ও সংগীত সৃষ্টির মতো একটা সৃষ্টি। এই সৃষ্টিই হলো ভাষা, কণ্ঠস্বর, ভঙ্গিমা ও চালচলন, শব্দ ও ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতির এক ঐক্যবদ্ধ মিশ্রণ এবং এদের মাধ্যমে মানুষের আচরণের মহানুভবতার প্রকাশ।' সেজন্য তিনি আমাদের অনন্ত চাহিদা (যথা খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য প্রভৃতি) ও কামনা বাসনার মধ্যে অদ্বৈতবাদ ও একত্বের উপরেই জোর দিয়েছেন। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে একত্বের উদ্দেশ্যই হলো অপরের সঙ্গে পরিপূর্ণ ভালবাসার যোগসূত্রের মাধ্যমের অসীমত্বকে উপলব্ধি করা। এখন আমার প্রশ্ন যে, রাজনীতিবিদরা কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথ আওড়ান তাঁরা কি রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধির কথা জানেন না? যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী, লেখক বা কবি ভারতের রাজীব গান্ধীর সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর উক্তিটিকে দুঃখজনক বলছেন, আমার মনে হয় তাঁরা রবীন্দ্রনাথের লেখাও ভালো করে পড়েননি বা বোঝেননি। তা যদি হতো তাহলে তাঁরা নিজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকেও সংযত থাকার উপেদেশই দিতেন। অতি সম্প্রতি তিনি 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি শুনে গাড়ি থেকে নেমে যে বাক্য প্রয়োগ করেছেন তা সমাজের চোখে তাঁর মর্যাদা হানিকর বলেই মনে হয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী স্বচেষ্টায় যে সম্মান অর্জন করেছিলেন, আমার মনে হয় তা তিনি নিজেই পদদলিত করছেন। ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে যথেষ্ট সংযত বলেই মনে হয়।

অর্থনীতির জনক অ্যাডাম স্মিথ বহু আগে

বলেছেন 'প্রকৃত শিক্ষার অভাব মানুষের প্রয়োজনীয় চরিত্রকে ছিন্নভিন্ন ও বিকৃত করে'। বর্তমানে রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপের ধর্ম ও প্রকৃতি দেখে এটাই মনে হয়। যেনতেন প্রকারে বিজেপি দলটিকে ক্ষমতায় থাকতে না দেওয়ার জন্য কংগ্রেস-সহ অন্য আঞ্চলিক দলগুলি পৃথকভাবে ও প্রয়োজনে জোট বেঁধে লেগে পড়েছিল। চারিদিকে স্লোগান ছিল—বিজেপি হঠাও রাজ্য বাঁচাও, দেশ বাঁচাও, গণতন্ত্র বাঁচাও ইত্যাদি। তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরাও সভা করে বিজেপিকে ভোট দেবেন না বলে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। বিজেপির বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল বিজেপি ধর্মের রাজনীতি করে, ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি করে, সাম্প্রদায়িকতা, নোটবন্দি, জি.এস.টি, কোনো উন্নয়নের কাজ করেনি, দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছে ইত্যাদি। এর থেকে মনে হয়, অন্য দলগুলি তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম ও অন্যান্য আঞ্চলিক দলগুলি অতিমাত্রায় দেশপ্রেমিক, গণতান্ত্রিক বা গণতন্ত্র প্রেমিক। এই অভিযোগগুলির সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণেই এর উত্তর পাওয়া যায়। প্রথমত ধর্মের কোনো রাজনীতি হয় না। বরং রাজনীতিরই বিশেষ বিশেষ ধর্ম হয় ও তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনৈতিক, অযৌক্তিক এবং তা পশ্চিমবঙ্গের তথা ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যবিরোধী ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিপন্থী। আমাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ গীতার ব্যাখ্যায় গেলে বলতেই হয় মানুষের প্রকৃতি ও স্বভাব নিয়ত কর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনই ধর্ম। গীতাতেই বলা হয়েছে 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগশঃ'। আবার যদি আমরা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় যাই তাহলে বলতে হয় মানববৃত্তির উৎকর্ষ সাধনই হলো ধর্ম। সেজন্য তিনি আমাদের সমস্ত শারিরীক ও মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন ও পরিচালনাকে ধর্ম বলেছেন এবং তার অভাবই হলো অধর্ম। প্রসঙ্গত, বঙ্কিমচন্দ্রই সর্বপ্রথম দেশপ্রেমের ধর্মকে (Religion of Patriotism) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পুরোভাগে এনেছিলেন। তাঁরই সৃষ্টি 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের মাধ্যমে বিপন্ন ভারতবাসীর মধ্যে অন্তর্নিহিত 'ব্রহ্মত্বের' বিকাশ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর লেখা দেবী চৌধুরাণী, ধর্মতত্ত্ব, আনন্দমঠ উপন্যাসই তার সাক্ষ্য বহন করে। বালগঙ্গাধর তিলক, দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ মনীষীও ধর্মীয় চেতনার ও আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমে ভারতবাসীকে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রার্থী জয়প্রকাশ মজুমদারকে লাথি মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম বলতে স্ব-স্বরূপকে জানা, জীবজগতের প্রতি প্রেম ও ভালোবাসা, সর্বধর্ম সমন্বয়কেই বুঝিয়েছিলেন। তাঁরই শিষ্য স্বামীজী কর্মকেই ধর্ম বলেছেন ও শিবজ্ঞানে জীব সেবার কথা বার বার বলেছেন। তাঁর মতে হিন্দু ধর্মের মূল উপাদানই হলো ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং মানুষের মধ্যে ব্রহ্মত্ব জাগানো। সুতরাং এই ধর্মের মধ্যে রাজনীতির স্থান নেই। আসলে হিন্দুত্ব ও ধর্ম কোনো রাজনৈতিক দলের হয় না। সনাতন হিন্দু ধর্মের মূল কথাই হল অচ্ছেদ্য, অভিন্ন জাগতিক প্রীতি ও ভালবাসা। অর্থাৎ 'সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভুতানি চাত্মনি। ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শন'। অর্থাৎ যোগযুক্ত হয়ে সর্বভূতে আপনাকে দেখা এবং আপনাতে সর্বভূতকে দেখা ও সর্বত্র সমান দেখা। এটাই ধর্ম। আর ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য ভারতে শাশ্বত। কবিদের লেখাই তার প্রকাশ—''নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান'' ও ''শক, হুন দল পাঠান মোগল একদেহে হল লীন'' ইত্যাদি। সম্প্রদায় মানে যদি দল বা গোষ্ঠী হয় তাহলে সমস্ত রাজনৈতিক দলই সাম্প্রদায়িক। কারণ সকলেই একে অপরের বিরুদ্ধে বলছে বা কাজ করছে। শ্রমিক সম্প্রদায় ও মালিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ লাগানোও সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি, জাতপাতের রাজনীতির কথা যদি বলতে হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গেই তা বেশি হচ্ছে। মতুয়া উন্নয়ন পর্ষদ গঠন, নমঃশূদ্র উন্নয়ন পর্ষদ গঠন, ইমাম ভাতা, সম্প্রতি পুরোহিত ভাতা (পরিকল্পনা আছে), দক্ষিণেশ্বরের, কালীঘাটে স্কাইওয়াক তৈরি, দুর্গাপূজায় টাকা দেওয়া, দুর্গা কার্নিভাল করা প্রভৃতি কি ধর্মীয় তোষণের রাজনীতি নয়।?

আসলে ভারত হলো ধর্মভিত্তিক দেশ। এই জন্যই ঋষি অরবিন্দ বলেছেন ''It is for the Dharma and by the Dharma that India exist''। অর্থাৎ ধর্মের জন্যই এবং ধর্মের দ্বারাই ভারতের অস্তিত্ব। এই ধর্ম বলতে তিনি সনাতন হিন্দু ধর্ম বা জাতীয়তাবাদকেই বলেছেন এবং এর মধ্যেই সমস্ত ধর্মের মূল কথা অন্তর্নিহিত আছে যা হলো আমরা তাঁর মধ্যে বাস করছি, তাঁর মধ্যেই চলাফেরা করছি, তাঁর মধ্যেই সবকিছু পাচ্ছি, তিনিই আমাদের মধ্যে আছেন। সুতরাং ধর্মের রাজনীতি বলে কিছু হয় না, রাজনীতির কতকগুলি খারাপ দিক হয় যা পশ্চিমবঙ্গেই বিশেষভাবে প্রতীয়মান। এটা লজ্জার। অতএব গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বহুদলীয় রাজনীতির অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে, মানুষের হাতে বিচারের মানদণ্ড তুলে দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক রাজনীতিই শ্রেয়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

আত্মঘাতী বাঙালের আস্তাকুঁড় সন্ধান

কে. এন. মণ্ডল

আত্মঘাতী বাঙ্গালি প্রসঙ্গে নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেছেন, ''বাঙালির কাহিনি বাংলাদেশের মধ্যেই আবদ্ধ থাকিলেও বাঙ্গালি জীবন তুচ্ছ ছিল না। পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙ্গালির স্থান থাকিবে সেই লুপ্ত জীবনের ইতিহাসের জন্য। যে তিন মহান বাঙ্গালি—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্র জীবিত অবস্থায় উৎপীড়ন (?) করিয়াছিল— এখন তাঁদের পূজা নূতন করিয়া শুরু হইয়াছে। ইহার দুইটি দিক আছে, দুই-ই অবশ্য বর্তমান বাঙ্গালি জীবনের তুচ্ছতা ও কীর্তিহীনতার ফল। উহার একটি দিক ঘৃণ্য, অপরটি দুঃখজনক।''

উদ্ধৃতিটি বর্তমান কালের বাঙ্গালির আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পশ্চাদ্‌গামিতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলেই নীরদবাবুকে টেনে আনতে হলো। আমরা বাঙ্গালিদের পছন্দ হোক বা না হোক, নীরদচন্দ্র চৌধুরী বর্তমান শতাব্দীর বাঙ্গালি মনীষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব—তা তিনি নোবেল পুরস্কার না পেলেও। তবে ব্রিটিশ সরকার ও গ্রেট ব্রিটেন এই ছোটোখাটো চেহারার বাঙ্গালিকে বড় মাপের সম্মানে ভূষিত করে একবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতির আকাশে বাঙ্গালির সম্মান বৃদ্ধি করেছে নিঃসন্দেহে। যদিও দেশে তাঁর সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কারের বাইরে শিকে ছিঁড়েনি। এর একটি বড়ো কারণ নীরদবাবুর প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা। নীরদ চৌধুরীকে সাম্মানিক ডি-লিট উপাধি প্রদান করেছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সাহিত্য কর্মে উৎকর্ষতার মর্যাদা দানে। ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাঁকে নিজ হস্তে Commander of the British Empire শিরোপা প্রদান করেন। এছাড়াও তাঁর বই The Continent of Circe-এর জন্য Duff Cooper Memorial Award পুরস্কারে ভূষিত হন, যা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার (বুকার দেওয়া হয় উপন্যাসের জন্য)। বিদেশে প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও দেশে যথাযোগ্য সম্মান না পাওয়ার কারণ সম্ভবত লুকিয়ে আছে নীরদবাবুর কথায় 'আত্মঘাতী বাঙালি' চরিত্রে।

উনবিংশ শতকে বাঙ্গলায় নবজাগরণের ঢেউ ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র, রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, সুভাষচন্দ্র-সহ বহু বাঙ্গালি মনীষীর অবদানে। শুধু বাঙ্গলা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষকে নবজাগরণের ঢেউয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রবাদপ্রতিম এই সকল ব্যক্তিত্বদের বিরুদ্ধাচারণ হয়েছে বাঙ্গলা থেকেই। বাঙ্গালি জাতি একটি মহান সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে গড়ে না উঠে ব্যক্তি-নির্ভর উৎকর্ষতায় গৌরবান্বিত হয়। আর সেই গৌরব ওই ব্যক্তিবর্গের তিরোধানের পরে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যায়। চরম স্বার্থপরতা, গোষ্ঠী কোন্দলে জড়িয়ে পড়েন অনেকে। নীরদবাবু বলেছেন, 'বাঙ্গালির মধ্যে একটি চালাকির ঝোঁক আছে। তার জন্য সে অনেক ব্যাপারে মেকি হয়ে পড়ে।' উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙ্গালির সমস্ত গৌরব বর্তমানের বাঙ্গালি হারাতে বসেছে। ক্ষুদ্র ঈর্ষা, নিজেদের মধ্যে বিদ্বেষ, কলহ এবং পদের মোহে কাঙ্গালের মতো কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে। বিগত যুগে বাঙ্গালি ভদ্রলোক সাহিত্য, ধর্ম, জ্ঞানান্বেষণ ও রাজনীতিতে আগ্রহ না দেখালে ভদ্রলোক বলে গণ্য হতেন না। বর্তমানে ভদ্র সমাজ যেরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে তাতে অর্থহীন (সম্পদহীন) হলে জাতিচ্যুত হবার সম্ভাবনা পদে পদে, কিন্তু কালচারহীন হলে কোনো আশঙ্কা নেই।

যাদের সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকার ঝুঁকি নিয়ে এই আইন পাশ করেছে তারা অর্থাৎ 'আমরা বাঙালরা' নিরুত্তাপ-নিরুদ্বেগ। এখনই এই আইনের পক্ষে জোরালো আওয়াজ না তুললে আমরা 'আত্মঘাতী বাঙাল'রা নিক্ষিপ্ত হবো ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

বাঙ্গালি রাজনীতিকরা (কংগ্রেস) ১৯৩৭ সালে বাঙ্গলায় সরকার গঠনে ফজলুল হকের কৃষক প্রজা পার্টিকে সমর্থন না করায় মুসলিম লিগের সরকার গঠন, ফজলুল হক সাহেবের মুসলিম লিগে যোগদান এবং ১৯৪০ সালে লিগের লাহোর অধিবেশনে পাকিস্তানের প্রস্তাব পেশ ইত্যাদি ঘটনায় বাঙ্গলা ও বাঙ্গালির আত্মহননের যাত্রা শুরু। তাছাড়াও একমাত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ছাড়া কংগ্রেসের অধিকাংশের মধ্যেই একটি দাস মনোবৃত্তি কাজ করে। তা থেকে বাঙ্গালি মুক্তি পায়নি। নেতাজী সুভাষ ছাড়া আর একটি ব্যতিক্রমী চরিত্র ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। অবশ্য সেজন্য তাঁকে নেহরুর মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করতে হয়। তবুও বাঙ্গালি সত্তার যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দান মনে করেন এই নিবন্ধকার।

রাজনীতিতে আত্মঘাতী বাঙ্গালির তালিকা দীর্ঘ। যাঁরা কলকাতা নরসংহার এবং নোয়াখালি হিন্দু গণহত্যার নায়ক সুরাবর্দির সঙ্গে যুক্ত বাঙ্গলার বা সার্বভৌম বাঙ্গলার স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁদের ব্যর্থতা হিন্দু বাঙ্গালিদের সামগ্রিকভাবে না হলেও গরিষ্ঠাংশকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তা ধরে রাখাই এখন বাঙ্গালির পরীক্ষা। তবে পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালি স্বার্থে অন্তর্ঘাতের দায়ে অভিযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মন্ত্রিত্বের লোভে জিন্নার দাবার ঘুঁটি হিসেবে কাজ করলেও, শীঘ্রই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারেন এবং ভারতে পালিয়ে এসে মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তাফা দেন। তবে এর মধ্যেই হিন্দু বাঙ্গালি, মূলত তথাকথিত নিম্নজাতির মানুষের জীবন ও সম্পত্তির বিপুল ক্ষতি হয় উপর্যুপরি জেহাদি আক্রমণে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগের পরে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সংখ্যালঘুদের অধিকাংশ ভারতে চলে এলেও, পূর্ববঙ্গে

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের প্ররোচনায় আর্থিকভাবে দুর্বল এবং সামাজিক ভাবে পশ্চাৎপদ নমঃশূদ্ররা পূর্ববঙ্গে থেকে যান এবং বারংবার জেহাদি আক্রমণের মুখোমুখি হন। তা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে থেকে যাওয়া সংখ্যালঘুদের প্রত্যাশা নবগঠিত বাংলাদেশ পূরণ করতে পারেনি। ফলে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরেও বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের পলায়ন অব্যাহত থাকে। আওয়ামি লিগের শাসনকালে এর গতি কিছুটা মন্থর হলেও কখনো তা বন্ধ হয়নি।

'আত্মঘাতী বাঙাল' কথাটির উৎস— নীরদচন্দ্র চৌধুরীর 'আত্মঘাতী বাঙ্গালি' বইয়ের অনুকরণে, তার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। ব্যাপক অর্থে বাঙ্গলায় বসবাসকারী বাঙ্গালিরাই বাঙ্গাল, অন্তত বাঙ্গলার বাইরের ভারতীয়দের চোখে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 'ঘটি-বাঙাল' শব্দগুলি বাঙ্গালি মাত্রেই জানা। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের কথা উঠলেই এই বিষয়টি অনেকের চোখের সামনেই ভেসে ওঠে, যদিও এই নিবন্ধকার-সহ অনেকেই এর ব্যতিক্রম। ইতিহাসগতভাবে গাঙ্গেয় বদ্বীপ এলাকার অন্তর্গত সুন্দরবন, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল (পদ্মা-মেঘনা-বলেশ্বর নদীর অববাহিকায়)-এ বসবাসকারী অন্ত্যজ, চণ্ডাল (পরিবর্তিত নাম নমঃশূদ্র) এবং নিম্নজাতির মানুষদের 'বঙাল' নামে অভিহিত করা হতো— এরাই বাঙাল। পাল রাজারা যেহেতু বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তাদের রাজত্বে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের অনেকেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। দ্বাদশ খ্রিস্টাব্দে সেন রাজাদের রাজত্বের সময় চণ্ডালদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায়, সেন রাজারা অনেক বৌদ্ধ ও চণ্ডালকে রাঢ়বঙ্গ থেকে সুদূর পূর্ববঙ্গে বহিষ্কৃত করেন, যাদের অনেকেই বর্তমান নমঃশূদ্র, বাকিদের অধিকাংশ মুসলমান রাজত্বে ইসলামে দীক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে মর্যাদায় নিম্নস্তরের পরাশর ব্রাহ্মণরাও শূদ্র বা চণ্ডালদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে চলে যান। কালের স্রোতে জাতি বিবর্তনের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ মিশ্র জাতির বাসস্থান হলো—তারাই সামগ্রিকভাবে বাঙাল নামে পরিচিত।

এই নিবন্ধে যে বাঙালদের নির্দেশ করা হয়েছে তারা মূলত পূর্ববঙ্গের মানুষ। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগের পরিণতিতে পূর্ববঙ্গের মৌলবাদী মুসলমান এবং ইসলামিক শাসনযন্ত্রে নিষ্পেষিত হয়ে মানসম্ভ্রম এবং বিষয় সম্পত্তি সর্বস্ব হারিয়ে এপার বাঙ্গলায় নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে মাথা গুঁজেছেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনীতির ছত্রছায়ায়, মূলত উদ্বাস্তুদের সামনে রেখে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, আবার কেউ কেউ অন্যভাবে প্রতিষ্ঠিত। আর গরিষ্ঠ সংখ্যক উদ্বাস্তু যারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ নিজেদের প্রচেষ্টায় দাঁড়িয়ে গেলেও, অধিকাংশ উদ্বাস্তু নাগরিকত্বহীন, পরিচয়হীন কঠোর জীবন সংগ্রামে লিপ্ত এবং রেললাইনের ধারে, খালের পাড়ে, পতিত জমিতে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। এদের নড়বড়ে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থানের জন্য ক্ষমতাসীন দলের ভোটব্যাঙ্কে পরিণত হওয়া বাধ্যবাধকতা। সুতরাং ওই সমস্ত মানুষ আত্মমর্যাদা এবং স্বাধিকারে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হলে ভয় দেখিয়ে দলদাস করা সম্ভব হবে না। এটাই নাগরিকত্ব আইনের বিরোধিতার অন্যতম কারণ পশ্চিমবঙ্গে। দ্বিতীয় কারণ অবশ্যই মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক অক্ষত রাখা।

ক্ষমতালোভী রাজনীতিকদের রাজনীতিতে অঙ্ক কষা স্বাভাবিক, তা যদি দেশের স্বার্থ বা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হয় তাও। যা অস্বাভাবিক তা হচ্ছে, ওই বাঙাল উদ্বাস্তুরা বা তাদের বংশধরদের কেউ কেউ এপার বাঙ্গলায় এসে মহান সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষতার চৌকিদার এবং সংবিধানের বিশুদ্ধতা রক্ষার ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ। সংশোধিত নাগরিক আইনের বিরোধিতায় এরা তৃণমূল নেত্রীর ক্যা-ক্যা, 'আমরা সবাই নাগরিক' তত্ত্বে বিশ্বাসী। অথচ তাঁরা নেত্রীকে প্রশ্ন করেন না ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, রেশন কার্ড থাকা সত্ত্বেও অসমে এন.আর.সি-তে প্রায় ১৯ লক্ষ মানুষ যাদের গরিষ্ঠাংশ হিন্দু বাঙ্গালি, তাদের নাম উঠলো না কেন? কারণ অত্যন্ত সহজ। ওই সমস্ত কাগজ নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, তাই রাজীব গান্ধীর অসম চুক্তি অনুযায়ী তারা ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের আগে ভারতে এসেছেন তার প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছেন। হয়তো কিছু ক্ষেত্রে ভুল-চুক হয়ে থাকতে পারে। যেহেতু উদ্বাস্তুদের ভারতে পুনর্বাসিত করা ভারতের ঐতিহাসিক প্রায়শ্চিত্ত, তাই মোদী সরকারের নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের এই প্রয়াস। এর ফলে অসমের এনআরসিতে নাম না ওঠা উদ্বাস্তুরাও সুরক্ষিত থাকবেন। সুরক্ষিত থাকবেন—পশ্চিমবঙ্গে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু যারা ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পরে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, ভবিষ্যতে কোনো সরকার বা শীর্ষ আদালতের আদেশে এন.আর.সি চালু হলে। সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনে যে সমস্ত ধর্মের উল্লেখ রয়েছে তা শুধু উদ্বাস্তুদের চিহ্নিত করার জন্য, এর ভিত্তি ধর্ম নয়। জাতিসঙ্ঘের উদ্বাস্তু সংজ্ঞায় মুসলমানরা ভারতে উদ্বাস্তু নয়, কারণ তারা ধর্মীয় বা জাতিগত বৈষম্যের শিকার হয়ে ভারতে আসেননি। জাতীয়তা বিরোধী কিছু ব্যক্তি, দল এবং সংগঠন নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অপব্যাখ্যার দ্বারা জনমানসে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন। নাগরিক আইনের অভিঘাত এতই কি তীব্র এবং বিষাক্ত যে দিল্লির তীব্র শীত উপেক্ষা করে মায়ের কোলে মাংকি টুপি পরিহিত শিশুটিও প্রতিরোধে শামিল, কলকাতার রাস্তায় অবোধ শিশু-কিশোরদের সামনে রেখে কিছু ধান্দাবাজ টিভি চ্যানেলে মুখ দেখিয়ে পাড়ায় গর্বিত সমাজকর্মী সাজছেন। এসবই কি স্বতস্ফূর্ত না নির্মিত? শোনা যাচ্ছে শাহিনবাগে মাসাধিককাল ধরে সর্বসাধারণের একটি ব্যস্ত রাস্তা আটকে আন্দোলন চলছে। সেই প্রদর্শনীর খরচা নাকি প্রচুর (incidental cost too high)। কাদের প্ররোচনায় এবং আর্থিক আনুকূল্যে এ কাজ হচ্ছে তা খতিয়ে দেখে পুলিশ কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না?

একটি বিষয় লক্ষণীয়, সংশোধিত নাগরিক আইনের দ্বারা সর্বাধিক উপকৃত হবে পশ্চিমবঙ্গ। সারা ভারতে প্রায় ২ কোটি মানুষ এই আইনে উপকৃত হলে তার প্রায় ৭০% মানুষ বসবাস করছে পশ্চিমবঙ্গে। বাকিরা উত্তর-পূর্বের রাজ্যে এবং ভারতের অন্যান্য শহরে। আপাতদৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ওই সমস্ত এলাকায় বসবাসকারী মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা।

এরা এবং এদের পক্ষ নেওয়া কতকগুলি মৌলবাদী সংগঠন এবং ক্ষমতালোভী কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের প্ররোচনায় মাসাধিককাল ধরে মারমুখী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এর জন্য কালিমালিপ্ত হচ্ছে দেশের ভাবমূর্তি। অথচ, যাদের সুরক্ষা এবং পুনর্বাসনের জন্য সরকার ঝুঁকি নিয়ে এই আইন পাশ করেছে তারা অর্থাৎ 'আমরা বাঙালরা' নিরুত্তাপ-নিরুদ্বেগ। এখনই এই আইনের পক্ষে জোরালো আওয়াজ না তুললে আমরা 'আত্মঘাতী বাঙাল'রা নিক্ষিপ্ত হবো ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। ▌

দ্রৌপদীর অক্ষয়ভাণ্ড

কপট পাশাখেলায় হেরে পাণ্ডবেরা বারো বছরের জন্য বনে গেলেন। এইভাবে পাণ্ডবরা জব্দ হওয়ায় দুর্যোধন মহাখুশি। রাজ্য আর ভাগ করতে হবে না। সিংহাসনের দাবিদার আর কেউ রইল না। এখন সে ভারতবর্ষর একচ্ছত্র

অধিপতি। সর্বশক্তিমান সম্রাট। কিন্তু দুর্যোধনের পরামর্শদাতরা বলল শত্রুর শেষ রাখতে নেই। এসময় পাণ্ডবরা অসহায় হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাদের মেরে ফেলার এই সুযোগ। তা না হলে বনবাস শেষ হলে আবার ফিরে এসে রাজ্য চাইতে পারে।

দুর্যোধন বুঝল কথাটা সত্যি। পাণ্ডবদের শেষ করে দেওয়াই উচিত। তবে প্রকাশ্যভাবে কিছু করা যাবে না।। প্রজারা খেপে যেতে পারে। তাই কৌশলে কাজ করতে হবে। রাজসভায় যখন এই আলোচনা চলছে, সেই সময় দুর্বাসামুনি এসে হাজির। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়াল। সবাই ভয়ে তটস্থ। কারণ দুর্বাসামুনি যেমন তপস্বী, তেমনি বদরাগী। কেউ যদি নিজের অজান্তে বিন্দুমাত্রও অসৌজন্য দেখায় তাহলে আর রক্ষে নেই। তখনই রাগে জ্বলে উঠে শাপ দেবেন। আর সেই ব্রহ্মশাপ বড়ো ভয়ংকর। দুর্যোধন তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে মুনিকে পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে প্রণাম করে কুশল জিজ্ঞাসা করল। মুনিবর সন্তুষ্ট হয়ে পাণ্ডবদের কথা জানতে চাইলেন। দুর্যোধন বলল পাণ্ডবেরা এখন কাম্যকবনে বাস করছে। বনে যাবার সময় আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি বলে তারা দুঃখিত। সেই বনে গিয়ে যদি আপনি তাদের সঙ্গে দেখা করেন তাহলে তারা খুব খুশিই হবে। দুর্বাসামুনি দুর্যোধনকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন।

দুর্যোধন ইচ্ছে করেই মুনিকে এই মিথ্যে কথা শুনিয়েছিল। পাণ্ডবেরা এখন বনে খুব কষ্টে দিনাতিপাত করছে। এই অবস্থায় যদি দুর্বাসামুনি তাদের অতিথি হন তাহলে যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই তাঁর যোগ্য সমাদর করতে পারবে না। মুনি রেগে গিয়ে তাদের শাপ দেবেন। তাতে তারা ধ্বংস হবে। পাণ্ডবদের সর্বনাশ দুর্যোধনের রাত-দিনের কামনা।

দুর্বাসা কিন্তু যুধিষ্ঠিরকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি স্থির করলেন একদিন সুযোগমতো কাম্যকবনে গিয়ে পাণ্ডবদের সঙ্গে দেখা করবেন। তিনি বনচারী ঋষি। সময়-অসময়ের জ্ঞান নেই। একদিন রাত তখন অনেক। তিনি দশহাজার শিষ্য-সহ উপস্থিত হলেন যুধিষ্ঠিরের কুটিরে। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন আমরা আজ রাতে এখানে থাকব, তোমরা আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা কর। আমরা নদী থেকে স্নান-আহ্নিক সেরে আসি।

যুধিষ্ঠির মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। এখন একমাত্র ভরসা দ্রৌপদী। তার হাঁড়ির অন্ন শেষ হয় না। কিন্তু দ্রৌপদী বললেন, সে তো শুধু দিনের বেলা, এখন তো রাত। দ্রৌপদীর কথায় পাঁচভাইয়ের মাথায় বজ্রাঘাত হলো। দ্রৌপদী শেষ পর্যন্ত মনে মনে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বারকায়। তিনি পাণ্ডবদের বিপদের কথা জানতে পেরে গরুড়ের পিঠে চড়ে কাম্যকবনে পৌঁছেই দ্রৌপদীকে বললেন তার খুব খিদে পেয়েছে। দ্রৌপদী বললেন, প্রভু, আজ আর তো কিছুই নেই। শ্রীকৃষ্ণ বললেন দেখ এক কণা কিছু হলেই হবে। দ্রৌপদী খুঁজে খুঁজে হাঁড়িতে লেগে থাকা একটিমাত্র ভাতের কণা এনে শ্রীকৃষ্ণকে দিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাই খেয়ে তৃপ্তির সঙ্গে ঢেঁকুর তুললেন। তারপর যুধিষ্ঠিরের কাছে সব শুনে বললেন, তোমরা নিশ্চিন্ত হও, আজ আর দুর্বাসা মুনি আসবেন না। কাল দিনের বেলা দেখা যাবে।

পরদিন দুপুরে মুনি সশিষ্য এসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ কাল নদীতে জল পান করার ফলে আমাদের আর খিদে ছিল না। পেট আইঢাই করছিল। নদীর ধারে গাছের নীচে আমরা শুয়ে পড়েছিলাম। মুনির সব কথা শুনলেন যুধিষ্ঠির। তিনি বুঝে গেলেন শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর দেওয়া এক কণা ভাত খেয়ে ঢেঁকুর তুলেছিলেন। মনের সন্দেহ রেখেই তিনি হাত জোড় করে বললেন, মুনিবর, কাল আপনাদের খাওয়া হয়নি। আজ এখানে দয়া করে সেবা গ্রহণ করুন। মুনি রাজি হলেন।

আহারের আয়োজন হলো প্রচুর। দুর্বাসা আর তাঁর দশহাজার শিষ্য পরম তৃপ্তিতে ভোজন শেষ করলেন। পাণ্ডবদের মুখে হাসি। এবার তারা নিশ্চিন্ত। শ্রীকৃষ্ণের দয়ায় তারা বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন। পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীকে আশীর্বাদ করে সশিষ্য দুর্বাসামুনি বিদায় নিলেন।

শ্যামাপদ সরকার

ভারতের পথে পথে

অমৃতসর

পঞ্জাব প্রদশের সীমান্তবর্তী শহর অমৃতসর। ভারত থেকে পাকিস্তানের একমাত্র সংযোগকারী পথও গিয়েছে অমৃতসর হয়ে। ২৫ কিলোমিটার পশ্চিমে রয়েছে আট্টারি চেকপোস্ট। এপাশে ভারত, ওপাশে পাকিস্তান। মাঝে ফুট পাঁচেকের নো-ম্যানস ল্যান্ড। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে ফৌজি শৃঙ্খলায় আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ওয়াঘা সীমান্তের মূল বৈশিষ্ট্য। পঞ্জাবের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য অমৃতসর। শিখেদের অন্যতম পীঠস্থান এই অমৃতসর। এখানকার অন্যতম আকর্ষণ স্বর্ণমন্দির। স্বর্ণমন্দির লাগোয়া সরোবরের তীরে স্বর্ণগম্বুজ মাথায় শ্বেতশুভ্র পাঁচতলার অকাল তখত। মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে সরাইয়ের পিছনে সুন্দর বাগানের মাঝে অষ্টকোণাকৃতি বাবা অটল সাহিব গুরুদ্বারা। এখানকার 'গুরু কা লঙ্গর'-এ প্রতিদিন দশহাজার যাত্রীর প্রসাদ গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। স্বর্ণমন্দিরের একেবারে কাছেই জালিয়ানওয়ালা বাগ। অত্যাচারী ইংরেজদের বুলেটের দাগ নিয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে এর দেওয়াল। রয়েছে দুর্গিয়ানা মন্দির, গোবিন্দগড় দুর্গ, রামবাগ উদ্যান।

জানো কি?

- আলোর গতি আবিষ্কার করেন এ মাইকেলসন।
- ইলেকট্রন আবিষ্কার করেন জন থম্পসন।
- ল্যাপটপ এক ধরনের ছোটা কমপিউটার।
- প্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামের রচয়িতা লেডি অ্যাডোয়াগস্টা।
- প্রোটন কণিকা আবিষ্কার করেন রাদারফোর্ড।
- বিশ্বের সর্বপ্রথম ইলেকট্রনিক কমপিউটার হলো ENIAC (Electronic Numerical Intrigrator And Coputer.)

ভালো কথা

আমার আন্দামান ভ্রমণ

গত ১৬ জানুয়ারি আমাদের পরিবারের সবার সঙ্গে আমি বিমানে আন্দামান রওনা হই। যথাসময়ে আমরা পোর্টব্লেয়ার পৌঁছই। পরেরদিন থেকে শুরু হয় আমাদের আন্দামান পরিদর্শন। একে একে ন্যাচারাল পার্ক, রামকৃষ্ণ মিশন, চিড়িয়া টাপু (পাখিদের দ্বীপ), সেলুলার জেল, ছাথম কাঠ চেরাই কল, ছাথম ব্রিজ, দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের সংগ্রহশালা, সামুদ্রিক প্রাণীর সংগ্রহশালা প্রভৃতি দেখি। এরপর পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ নর্থ বে এবং রস আইল্যান্ড গিয়ে আমরা গ্লাস বোটে কোরাল দেখি। তারপর দিন নীল দ্বীপ ও হ্যাভলক দ্বীপের সীতাপুর সমুদ্রসৈকতে সূর্যোদয়, ভরতপুর সৈকতে সূর্যোদয়, ন্যাচারাল ব্রিজ, লক্ষ্মণপুর বিচ, রাধানগর বিচ, এলিফ্যান্ট বিচ, কালাপাথর বিচ ইত্যাদি দেখি। তারপর বারাডাঙে গিয়ে আন্দামানের আদিম অধিবাসী জারোয়া, চুনাপাথরের গুহা ও আগ্নেগিরি দেখে আন্দামান ভ্রমণ সমাপ্ত করি। ২৪ তারিখে আমরা বাড়ি ফিরে আসি।

রূপসা দেবনাথ, দশম শ্রেণী, বিরাটি, কলকাতা-৪৯

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) জ্র ন ব ক	(১) মৃ চ চৈ ন্য তা রি ত ত
(২) ত টি গ পা	(২) তি ং ণ রা হি সা প প্র য়

২৭ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) পেশিবহুল (২) ফন্দিফিকির

২৭ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) হাস্যপরিহাস (২) সৈন্যসমাবেশ

উত্তরদাতার নাম

(১) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা। (২) শুভ চৌহান, তুলসীতলা, রায়গঞ্জ, উঃ দিনাজপুর (৩) মৌমিতা দেবনাথ, বিরাটি, কলকাতা-৪৯। (৪) শুভদীপ রায়, ক্যানিং, দঃ ২৪ পরগনা।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

।। চিত্রকথা।। ডাক্তার হেডগেওয়ার।। ২২।।

১৯৩৭-এর ২২ মার্চ তিনি নাসিকে ছিলেন। মাননীয় রাজাভাউ শাঠের সঙ্গে যেতে যেতে একটি সাইনবোর্ড দেখতে পেলেন।

১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে ফৈজুপুর কংগ্রেস অধিবেশনের শুরুতে 'পতাকা' তোলার সময় গেল আটকে। কিশন সিংহ নামে একজন স্বয়ংসেবক উঁচু পতাকাদণ্ড বেয়ে উঠে পতাকাটি ঠিক করে দিল। নিঃসন্দেহে এটা সাহসের কাজ।

ধুলিয়ার দেবপুর শাখাতে কিশন সিংকে ডেকে এনে ডাক্তারজী রুপোর কাপ দিয়ে তাকে সংবর্ধনা জানালেন।

১৯৩৭ সালের ২৩ মে পুনায় 'সোনার হনুমান সত্যাগ্রহে যোগ দিলেন।

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আর কতকাল নৈরাজ্য ভোগ করবে?

ডাঃ আর এন দাস

৩০ এপ্রিল ১৯৮২ সাল। এই সেই অভিশপ্ত দিন যেদিন অবধূত আচার্য গিরীশানন্দ, আচার্য বীরেন্দ্র ব্রহ্মচারী, অবধূতিকা আনন্দপ্রচেতা- সহ ১৭ জন গেরুয়াধারী আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী আর সন্ন্যাসিনীকে বন্ডেলগেট আর বিজনসেতুর মতো জনবহুল এলাকায় দিনদুপুরে পেট্রোল ঢেলে আগুনে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী। ইন্দিরা গান্ধী বলেছিলেন, 'বে-নজির এই হত্যাকাণ্ড'। মহানগর কলকাতায় কয়েক হাজার মানুষের চোখের সামনে, বাঙ্গলার কমিউনিস্টদের বিকৃত আদর্শের নৃশংসতায় হতবাক হয়ে যায় বিশ্বমানবতা। এরই নাম ছিল রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ। অপরাধ যারা ঘটিয়েছে বা যেসব রাজনৈতিক নেতাদের নেতৃত্বে এটা ঘটেছিল, তাদের কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো শাস্তিই হলো না! অনেক সাক্ষী ছিল কিন্তু শাসকশ্রেণী ও হার্মাদবাহিনীর ভয়ে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়নি। সেই সময়কার আনন্দবাজার, যুগান্তর, দ্য স্টেটসম্যান, পাইওনিয়ার ইত্যাদি অনেক পত্রপত্রিকায় বিস্তর লেখা হলো। কিন্তু রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সঙ্গে কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর যোগসাজসে কোনো সিবিআই তদন্তও হলো না।

২০১১ সালে মমতা নির্বাচনী সভায় জোর গলায় ঘোষণা করেছিলেন, ক্ষমতায় এলে সিপিএমের সমস্ত কুকীর্তির যথাযথ তদন্ত হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের শাস্তিও হবে কিন্তু সেই মমতাই আজ সিপিএমের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুসলমানদের জন্য পশ্চিমবঙ্গকে পশ্চিমবাংলাদেশ বানাতে বদ্ধ পরিকর হয়েছেন। যে কমিউনিস্টরা মারিচঝাঁপির মতো নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঠাণ্ডা মাথায় করতে পারে সেই অত্যাচারী সিপিএমকে পশ্চিমবঙ্গের বুক থেকে সরিয়ে, ৩৪ বছরের অপশাসনের অবসান হবে মনে করে সবাই তৃণমূলকে ক্ষমতায় আনল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তারা সিপিএমেরও বাড়া। আমরা সবাই প্রাণখুলে মমতার ভাষণ শুনতাম, সমর্থন করতাম। তখন কি জানতাম 'মা-মাটি-মানুষের' অঙ্গীকার করা মমতার এ ছিল এক রাজনৈতিক চাল! যে অত্যাচারী কমরেডরা এতদিন সিপিএমের পোষা অলিখিত পোশাকহীন সৈনিক ছিল মমতার আশীর্বাদে তারাই লাল থেকে সবুজ জার্সি পাল্টিয়ে রাতারাতি তৃণমূলি হার্মাদ হয়ে আজকের বিরোধীদের মানে বিজেপি, আরএসএস ও বজরং দলের সদস্যদের খুন করছে নির্বিবাদে।

ফাইলচিত্র

গত পঞ্চায়েত ভোটে ৭২ জন বিরোধী কর্মীকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে 'মমতা' তার নামের মর্যাদা রেখেছেন। পুরুলিয়ার মাত্র ১৮ বছর বয়সের বিজেপি সমর্থক, ত্রিলোচন মাহাতোকে গ্রামের প্রান্তে গাছের মগডাল থেকে ফাঁসি দিয়ে প্রচার করলেন, সে নাকি আত্মহত্যা করেছে! তিনি ভারতের সংবিধানের প্রতি আস্থা রেখে শপথ গ্রহণ করার সময় 'আল্লা ও ঈশ্বরের' নামে অঙ্গীকার যেদিন করে কুর্শিতে আসীন হলেন, সেইদিনই আমরা বুঝতে পেরেছিলাম তিনি ৩০ শতাংশ মুসলমানের সামায্য নিয়েই জিততে পেরেছেন। কেননা প্রকৃত অপরাধী, খুনী, ধর্ষক, ব্ল্যাকমেলার, তোলাবাজ ও মস্তানরাই হচ্ছে তার 'দুধদেওয়া' মুসলমান ভাইজানরা।

সাল ১৯৮২। সেদিন বহু মানুষ দেখলেন কীভাবে অসহায় নিরস্ত্র গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীদের পেট্রোল ঢেলে দিনদুপুরে হত্যা করা যায়। বহু বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, নাট্যকার, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার চোখ বুঁজে ছিলেন কারণ সিপিএমের হার্মাদ বাহিনীর ভয়ে কেউই মুখ খুলতে রাজি হননি। হিন্দুবাঙ্গালি 'মাছের ঝোল, মুরগির বিরিয়ানি আর ম্যাটিনি শোতেই মশগুল ছিলেন। সময় কোথায় অন্য চিন্তা করার? সে সময় নির্ভীক আনন্দবাজারের অভীক সরকার আর গৌরকিশোর ঘোষ ছিলেন। আজ আর তাদের জায়গায় কাউকেই আসতে দেখছি না। তার কারণ মমতা সংবাদপত্রের মালিকদের কিনে নিয়েছেন অথবা মুসলমান, প্রশাসন আর পুলিশের ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রেখেছেন। তাই দেখি যারা 'ভগবান ছাড়া কাউকে ভয় করতেন না', তারাও আজ মমতার 'পে রোলে' নাম লিখিয়েছেন।

ছেলেধরা এই মিথ্য অপবাদ দিয়ে লাগাতার পুরুলিয়ার আশ্রমে ধারাবাহিক আক্রমণ চালিয়ে তাদের আনন্দমার্গ আশ্রমকে শেষ করে দিতে বদ্ধপরিকর ছিল সিপিএমের মন্ত্রীরা। কোথাও কোনো ছেলে হারিয়েছে এমন কোনো রিপোর্ট কিন্তু কখনও কোথাও পাওয়া যায়নি। বরং সেই সব গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীরা অনাথ অথবা অভাবগ্রস্থ ছেলেমেয়েদের হিন্দুসংস্কৃতির মধ্যে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে আদর্শ মানুষ গড়ার কারিগর হয়েছিলেন। লেখক নিজে লেকটাউনের আচার্য কৃষ্ণেশ্বরানন্দজীর কাছে 'নিও হিউম্যানিজম বা প্রাউট দর্শনে'র সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য

ফঃ ৬

অর্জন করেছিলেন। ১৯৬২ সালে পুরুলিয়ার অনুর্বর, অনাবৃষ্টি ও খরা-পীড়িত গড়জয়পুরে মহারাণী প্রফুল্লকুমারী দেবীর বদান্যতায় 'আনন্দমার্গ' আশ্রমটি গড়ে উঠে। আজ সেই পুরুলিয়াতে ব্যাঙের ছাতার মতো অসংখ্য মসজিদ গড়ে উঠেছে রাজনৈতিক মাতব্বরদের সহায়তায়। অর্থাৎ এর পিছনে ছিল এক আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র! আজ একথা দেশেবিদেশের সবলোকই জানে মুসলমান আর মার্ক্সিস্টরা একে অপরের পরিপূরক। সাম্প্রতিক নির্বাচনে ইংল্যান্ডের ভারতবিরোধী, পাকিস্তানপন্থী বামপন্থী নেতা 'জেরেমি কোরবিনে'র হার, সেই দেশের রাষ্ট্রবাদী চেতনার উন্মেষের জন্যই সম্ভব হয়েছে। অনেকেই জানেন না ১৯৬৭ সালের ৫ মার্চ, পুরুলিয়ায় সিপিএমের হার্মাদবাহিনী একই দিনে পাঁচজন আনন্দমার্গীকে নৃশংসভাবে গণহত্যা করেছিল। এইভাবে চোরাগোপ্তা গুপ্তহত্যা প্রণালী অনেকদিন ধরেই চলছিল। অনেকে অত্যাচারীদের হাতে মার খাওয়া ছাড়াও ভয়ানক ভাবে আহত হয়ে চিরদিনের জন্য পঙ্গু হয়ে গেছেন। ধারাবাহিক আক্রমণের শিকার হতে থাকেন এক হিন্দু সন্ন্যাসীকে জীবন্ত জলসমাধি দেয়। রক্তপাতহীন খুন। হত্যাকারী আজও জীবিত এবং সশরীরে তৃণমূলের দাগী আসামী হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই আশ্রম পরিসরেই ১৯৭৮ সালে আনন্দমার্গ সমর্থক রাজু সোরেনকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে।

১৯৭৮ সালে প্রধান কার্যালয় খোলা হয় তিলজলায় একেবারে সিপিএম প্রভাবিত এলাকায়। 'সিন্ডিকেট রাজ' তো ছিলই, ইট, বালি ও সিমেন্ট লোপাট হয়ে যেতে থাকলে। ড্রেনের কালভার্ট ভাঙা হলো বারবার যাতে করে লরি আসতে না পারে। নিষ্ক্রিয় পুলিশকে বললেও কোনো লাভ হতো না। ১০ জুন ১৯৭৯ সালে গণশক্তির সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত সিপিএমের রাজ্য কমিটি থেকে লিখলেন, 'আনন্দমার্গীদের দ্বারা রচিত সাম্প্রদায়িকতা, বিচ্ছিন্নবাদ প্রাদেশিকতা এবং জনগণের ঐক্য বিনাশকারী শক্তিকে রুখতে হবে'। এই সেই প্রমোদবাবু যিনি পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলমানের তাড়া খেয়ে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তার বাবাকে জিহাদিরা ঢাকাতেই কবর দিয়েছিল। শেষকৃত্যে যাবার সময়ও পাননি তিনি। পার্টির মুখপত্র 'গণশক্তিতে' লিখেছিলেন, 'আনন্দমার্গীরা স্বেচ্ছসেবীদের নরহত্যা-সহ, তাণ্ডবনৃত্য ও অন্যান্য হিংসাত্মক কার্যকলাপে শিক্ষিত করে। আনন্দমার্গের আধা-ফ্যাসিস্ট ধরনের ভিএসএস নামক স্বেচ্ছাসেবীরা বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে। ধর্ম ও সেবার আড়ালে এরা উগ্র সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে'। অবধূত পূর্ণানন্দের ভাষায়, 'মিথ্যে অপবাদ দিয়ে, ১৯৮২-তে আনন্দমার্গের সন্ত্রাস সৃষ্টির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে তিলজলাতেই 'নাগরিক কনভেনশনের' আয়োজন করা হয়েছিল। সাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন সাংসদ সন্তোষ মিত্র ও সত্যসাধন চক্রবর্তী। তাছাড়া ছিলেন আনন্দমার্গী হত্যাকাণ্ডের মূলপাণ্ডা শচিন সেন, গঙ্গাধর নস্কর, কান্তি গাঙ্গুলি, গুরুপদ বাগচি, চিন্ময় হাজরা, 'মিচকে বাবলু' এমনকী সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও ১১৭ জন তথাকথিত বামপন্থী নেতা। তারা হুঁশিয়ারি দিলেন, 'শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এলাকার সমস্ত মানুষকে আহ্বান জানানো হচ্ছে'।

৩০ এপ্রিল ১৯৮২ সাল। তিলজলায় আনন্দমর্গ আশ্রমে বার্ষিক ধর্ম-সম্মেলন করা হয়েছিল। দেশ ও বিদেশ-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সাধু ও সাধিকারা আসছিলেন সম্মেলনে যোগ দিতে। অন্যদিকে আর এক প্রস্তুতি চলছিল সবার অলক্ষ্যে। বন্ডেলগেট ও বিজনসেতুতে আগের দিন সন্ধ্যেবেলায় সিপিএমের গুন্ডাবাহিনী ও ক্যাডাররা স্লোগান দিয়ে, আনন্দমার্গের আশ্রমের চারিদিকে 'ছেলেধরা' বলে মাইকে প্রচার চালাচ্ছিল। হাওড়া স্টেশন থেকে নেমে ট্যাক্সিতে চেপে আরও অনেক সাধু ও সাধ্বীরা কলকাতার আশ্রমের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস। যেই পৌঁছালেন বন্ডেলগেট আর বিজনসেতুতে, তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল লাঠিসোটা হাতে যমসদৃশ পুরুষ আর মহিলাসমেত শ'খানেক হার্মাদ। ট্যাক্সি থেকে টেনেহিঁচড়িয়ে নামানো হলো ১৭ জন গেরুয়াধারী অসহায় দুর্বল সাধু ও সাধ্বীকে বিনা অপরাধে নৃশংসভাবে খুন করার উদ্দেশ্যে। সারা বিশ্ব নির্বাক হয়ে দেখল প্রাচ্যের সংস্কৃতি আর সভ্যতার আলো কীভাবে নিভে যায় পাশ্চাত্যের উগ্র-মার্কসীয় দর্শনের লেলিহান অগ্নিশিখায়। কেরোসিন পেট্রোল, ডিজেল, লাঠি, লোহার রড, ধারালো দা, কুড়ুল, লোহার পাত, তলোয়ারের মতো মারাত্মক সব অস্ত্র— এদের আগে থেকেই জোগাড় করা ছিল।

বিবস্ত্রা সাধ্বীদের শ্লীলতাহানি করা হলো এবং পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে সমস্ত অপরাধের প্রমাণ লোপাট করা হলো সরকারি অনুমোদন এবং পুলিশের সহযোগিতায়। ভারতে পারছেন স্বাধীনভারতে হিন্দুদের উপর কীরকম অত্যাচার করা হয়েছে? বলতে পারবেন জেহাদি মুসলমানদের উপর কোনো শাসকদল এইরকম অত্যাচার করলে কি ভয়ংকর অবস্থা হতে পারতো? হিন্দুরা সহনশীলতা দেখিয়ে এসেছে গত ১০০০ বছর ধরে। আজকের শাসক অর্থাৎ এই নীতিহীন, ভ্রষ্টচারী, লোভী, দেশদ্রোহী, কামুক ও লম্পট রাজনেতাদের শেষের দিন ঘনিয়ে এসেছে। নিপীড়িত, ধর্মভীরু হিন্দুদের মধ্যে সচেতনতা আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে। প্রখর রাষ্ট্রবাদী পুষ্পেন্দ্র কুলশ্রেষ্ঠের মতে, 'যদি মাত্র ১ শতাংশ রাষ্ট্রবাদী হিন্দু এগিয়ে আসে, তাহলেই মায়া-মমতা-মুলায়মের মতো মুসলমান ভোটের ভিখারী ২৮টি বিপক্ষপার্টির নেতাদের কারসাজি ধরা পড়বে এবং জনতাই তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবে। সেই নারকীয় হত্যাকাণ্ডের মূলপাণ্ডা ছিলেন তিলজলার বিধায়ক শচিন সেন। তারই প্ররোচনায় এবং মিথ্যা দোষারোপে জনগণের মধ্যে আনন্দমার্গীদের বিরুদ্ধে এক স্বতঃস্ফূর্ত আক্রোশ দেখা দিয়েছিল। সেই অমানবিক হত্যার প্রতিবাদে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা মৌনমিছিল বার করেন। ১৪৪ ধারা জারি করে, তাদের পথরোধ করা হয়। আশাপূর্ণা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী, শৈবাল গুপ্ত, অধ্যাপক নির্মল ভট্টাচার্য, সুনন্দ সান্যাল, গৌরকিশোর ঘোষ, অন্নদাশংকর রায়রা প্রমুখ ছিলেন।

সত্যজিত রায় অসুস্থতার কারণে আসতে পারেননি। ১৯৮২ সালে তিলজলা থানার ওসি গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, যিনি এই সুপরিকল্পিত খুনের তদন্ত করছিলেন, রহস্যজনক ভাবে তিনি খুন হয়ে গেলেন। দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী, মানবাধিকার কর্মীর ভাষায়, 'যদি আনন্দমার্গীরা বেআইনি অস্ত্রশস্ত্র রাখে, তবে তার আইনি ব্যবস্থা কেন নেওয়া হলো না'। ভয়ের কারণে আনন্দমার্গীদের পক্ষে কেউ সাক্ষী দিতে রাজি হলো না। মাওসেতুং আর স্টালিনের উত্তরসূরি বামপন্থীরা বুঝিয়ে দিয়েছিল, যদি কেউ সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করে তবে তার পরিণাম হবে ভয়ংকর। ■

দুই মায়ের দুই উজ্জ্বল সন্তান

রূপশ্রী দত্ত

স্বামী বিবেকানন্দের জননীর নাম ছিল ভুবনেশ্বরী দেবী (১৮৪১-১৯১১)। মাতৃ-মাহাত্ম্য তিনি সারাজীবন ধরে অনুভব করে গেছেন। কখনও বলেছেন— 'যে ব্যক্তি আক্ষরিক অর্থে মাকে পূজা করে না, সে কখনও মহৎ হতে পারে না।' ভুবনেশ্বরী ছিলেন শান্ত, স্থিতধী, ভক্তিপ্রাণা, সাহসী ও দৃঢ়চেতা মহিলা। বিবেকানন্দের জন্মের আগে, তিনি শিবমন্দিরে আন্তরিক পূজা নিবেদন করেছিলেন। তাই জ্যেষ্ঠপুত্র নরেনকে তিনি শিব-প্রভাবিত ও শিবের আশীর্বাদপূত মনে করতেন। বালক নরেনের দুষ্টুমিতে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি পুত্রের মাথায় 'শিব শিব' উচ্চারণ করে জল ঢালার সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত বালক মন্ত্রবৎ শান্ত হয়ে যেত। কখনও বা নরেনের বাল্যকালে, ভুবনেশ্বরী বলতেন যে তিনি শিবপুজো করেছিলেন কিন্তু শিব নিজে না এসে, পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁর এক চ্যালাকে। বিবেকানন্দ স্বীকার করেছিলেন, শৈশবের সেই শিবের অনুষঙ্গে, পরবর্তীকালেও তিনি কর্মে নতুন উদ্যোগ ও প্রেরণা লাভ করতেন।

ভুবনেশ্বরীদেবী

সারদাদেবী

ভুবনেশ্বরীর স্বামী বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন হাইকোর্টের নামকরা অ্যাটর্নী। ভুবনেশ্বরী তখন ধনীর গৃহিণী ছিলেন। কিন্তু স্বামীর অকালমৃত্যুর পর, তাঁর জীবনে বিপর্যয় নেমে এল। জ্ঞাতি-শরিকরা, বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা করে তাঁকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করল। তাঁর স্বামীর দ্বারা একদা উপকৃত ব্যক্তিরাও তখন তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেনি। এমনকী, আইনের মারপ্যাঁচে, জ্ঞাতি-শরিকরা তাঁকে তাঁর বসতবাটি থেকেও অন্যায়ভাবে উচ্ছেদ করেছিল। তিনি তখন সন্তানদের নিয়ে চলে গিয়েছিলেন তাঁর পিতৃগৃহে। পিতা তখন পরলোকগত। মা একা। যেহেতু ভুবনেশ্বরী একমাত্র সন্তান, তাই নিঃসঙ্গ জননীর কাছেই ভুবনেশ্বরী ফিরে গেলেন। মাসিক হাজার টাকায় সংসারযাত্রা নির্বাহ করা ভুবনেশ্বরীকে তখন কায়ক্লেশে মাত্র ত্রিশ টাকায় সংসার চক্রকে চলমান রাখতে হতো। জ্যেষ্ঠপুত্র নরেন্দ্রের বয়স তখন কুড়ি। নরেন্দ্র বি.এ. পাশ করেও আকাঙ্ক্ষিত চাকরি লাভে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। নাবালক-নাবালিকা ভাইবোনের দায়িত্ব, মায়ের শারীরিক ও মানসিক কষ্টলাঘব কোনওটাই তাঁর দ্বারা সম্ভব হচ্ছিল না। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় ও সংসারের প্রতি বিরাগবশত, নরেন্দ্র তখন দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের শরণাগত হলেন। সর্বাপেক্ষা প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্রের এই গৃহত্যাগ ভুবনেশ্বরীর মনে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল। পরবর্তী আঘাত ভুবনেশ্বরীর জীবনে নেমে এসেছিল কন্যার মৃত্যুতে। উপর্যুপরি দুঃখবেদনার কষ্টিপাথরে, ভুবনেশ্বরীর অন্তঃকরণ হয়ে উঠেছিল খাঁটি সোনা। এই জননীর পরিমণ্ডল ত্যাগ করার দুঃখবোধ নরেন্দ্রকে আমৃত্যু তাড়া করে ফিরেছিল। তিনি মাকে ভগ্নশরীরেও পূর্ববঙ্গের কিছু কিছু তীর্থস্থান দর্শন করিয়েছিলেন। কালীঘটে ভুবনেশ্বরীর অনেক দিনের বকেয়া পূজানুষ্ঠান যথাবিহিত নিয়মানুসারে করিয়েছিলেন। অশনে, বসনে, ধ্যানে, ধারণায় ভুবনেশ্বরী ছিলেন পুত্রের কাছে শুদ্ধতার প্রতীক। জননীর কৃচ্ছ্রসাধন, ধর্মাচরণ, উপবাস তাঁর চোখে অসামান্য ব্যঞ্জনা নিয়ে ফুটে উঠত। সকলের খাওয়া হলেও, ভুবনেশ্বরী কখনও দ্বিপ্রাহরিক অন্ন দুই ঘটিকার আগে গ্রহণ করতেন না। মাঝখানে কোনও অতিথি এলে, নিজের অন্ন তাঁকে প্রদান করে, পরে নিজের সামান্য আহার্যের বন্দোবস্ত করতেন। বিশ্ববিখ্যাত প্রিয় পুত্রের অকালপ্রয়াণের নয় বছর পর ভুবনেশ্বরী প্রয়াতা হন। ভুবনেশ্বরীর ঈশ্বর নিবেদন পরবর্তী যুগের রবীন্দ্র-ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব
মঙ্গল-আলোক/তবে তাই হোক।'

দ্বিতীয় মনীষী-জননী হলেন, রবীন্দ্র-জননী সারদাদেবী। তৎকালীন বাল্যবিবাহের যুগে, কলকাতার জোড়াসাঁকোর বৃহৎ ঠাকুরপরিবারের বধূ হয়ে এসেছিলেন তিনি। বাণিজ্যে, ধনে মানে, শিক্ষাদীক্ষায়, প্রভাব- প্রতিপত্তিতে তখন ঠাকুরবাড়ি কলকাতার শীর্ষস্থানীয় পরিবার।

সারদা ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। তৎকালীন সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি সংস্কৃতি জগতের খবর তিনি সাগ্রহে অনুধাবন করার চেষ্টা করতেন। রামায়ণ মহাভারত তিনি নিয়মিত পাঠ করতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ দার্শনিক ও কবি, সত্যেন্দ্রনাথ মেধাবী ও কর্মজীবনে অত্যন্ত সফল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কবি ও নাট্যকার আর রবীন্দ্রনাথ এই সবেরই সম্মিলিত রূপ হয়ে বৃত্ত সম্পূর্ণ করেছিলেন। কন্যারাও বিদুষী ছিলেন। শৈশবে ভৃত্যদের তত্ত্বাবধানে তাঁর সন্তানদের দিন অতিবাহিত হয়েছিল, ঠাকুরবাড়ির রীতি অনুযায়ী। রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে এই প্রথার নাম দিয়েছিলেন 'ভৃত্যরাজতন্ত্র'। ১৮৭৫ সালের মার্চ মাসে মাত্র ৪৫ বছর বয়সে তিনি মারা যান। স্বামী দেবেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে গৃহত্যাগী হয়ে অল্পদিনের জন্য ফিরতেন। সারদা মাঝে মাঝে রবিকে সরময়দা সহযোগে ত্বকচর্চার জন্য ডাকতেন। মাঝে মাঝে মহাভারত পাঠের আসরেও, তাঁকে ডেকে নিতেন। ▮

এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সেরা পুরস্কার জল জীবন মিশন ট্যাবলো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জল শক্তি মন্ত্রকের 'জল জীবন মিশন' বিষয়ক অসাধারণ ট্যাবলোটি এবারের সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সেরা ট্যাবলোর পুরস্কার জিতে নিয়েছে। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর

(এনডিআরএফ) ট্যাবলোটিও সেরা ট্যাবলোর পুরস্কার পেয়েছে। জল শক্তি মন্ত্রকের ট্যাবলোতে জল জীবন মিশনে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে ২০২৪ সাল নাগাদ পাইপবাহিত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি তুলে ধরা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ আজ এখানে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে জল জীবন মিশন ট্যাবলোটিকে সেরার স্বীকৃতি প্রদান করেন। উল্লেখ করা যেতে পারে, জল শক্তি মন্ত্রকের এই ট্যাবলোতে প্রধানমন্ত্রীর প্রতিটি বাড়িতে পাইপবাহিত জল সরবরাহের যে পরিকল্পনা রয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এই কারণে এবারের কুচকাওয়াজে মন্ত্রকের এই ট্যাবলোটি অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত বছর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি বাড়িতে ২০২৪ সালের মধ্যে নিরবচ্ছিন্নভাবে পাইপবাহিত বিশুদ্ধ জল পৌঁছে দিতে 'জল জীবন মিশন'-এর সূচনার কথা ঘোষণা করেন। বর্তমানে দেশে ১৭ কোটি ৮০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে মাত্র ৩ কোটি ৩০ লক্ষ পরিবারে পাইপবাহিত জল সংযোগের সুবিধা রয়েছে। বাকি ১৪ কোটি ৬০ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারে ২০২৪ নাগাদ পাইপবাহিত বিশুদ্ধ জল পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

জল শক্তি মন্ত্রকের ওই ট্যাবলোতে সামনের দিকে ছিল একটি বৃহদাকার ধাতু নির্মিত জলের কল এবং ধাতু নির্মিত একটি পাত্র যা, লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারগুলির জলের চাহিদার বিষয়টিকেই প্রতিফলিত করে। ট্যাবলোর মাঝখানে জল জীবন মিশনের আওতায় উপকৃত গ্রামীণ পরিবারগুলিকে তুলে ধরা হয়েছে যেখানে একটি পরিবার রান্নাঘর, শৌচালয় ও অন্যত্র পাইপবাহিত জলের সুবিধা পাচ্ছে।

২০১৯ সালে কাশ্মীরে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা বেড়েছে—প্রহ্লাদ সিংহ প্যাটেল

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ নম্বর ধারা রদ, রামমন্দির নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কিংবা সদ্য সংসদে পাশ হওয়া নাগরিকত্ব সংশোধন আইনের দরুন ২০১৯ সালে বিদেশি পর্যটক আগমনের সংখ্যায় কোনও প্রভাব পড়েনি। পরিসংখ্যান দিয়ে সংস্কৃতি ও পর্যটন মন্ত্রী প্রহ্লাদ সিংহ প্যাটেল জানিয়েছেন, গত বছর দেশে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা বেড়েছে। ২০১৯-এর শেষ দু' মাসে ২০১৮'র ওই দু' মাসের তুলনায় বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। পর্যটক সংখ্যায় ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং দেশের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন। তিনি বলেন, চীনের রাষ্ট্রপতি শি জিংপিং-কে আপ্যায়িত করার পর তামিলনাড়ু-তে চেন্নাইয়ের নিকটবর্তী মামাল্লাপুরমেও (মহাবলিপুরম নামেও অধিক পরিচিত) পর্যটক আগমনের সংখ্যা বেড়েছে। ৯টি দেশ তার নাগরিকদের জন্য ভ্রমণ সংক্রান্ত পরামর্শ জারি করা সত্ত্বেও ভারতে বিদেশি পর্যটক আগমনের ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে।

শ্রী প্যাটেল পরিসংখ্যান দিয়ে জানান, ২০১৮'র নভেম্বর মাসে ভারতে আগত বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ১২ হাজার ৫৬৯। এই সংখ্যা ২০১৯-এর নভেম্বরে ৭.৮ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ১০ লক্ষ ৯১ হাজার ৯৪৬। একইভাবে, ২০১৮'র ডিসেম্বরে আগত বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১১ লক্ষ ৯১ হাজার ৪৯৮। ২০১৯-এর ডিসেম্বরে সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১২ লক্ষ ২৫ হাজার ৬৭২। বিদেশি পর্যটক আগমনের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশি মুদ্রা আয়ের পরিমাণও বেড়েছে। ২০১৮ সালের নভেম্বরে বিদেশি পর্যটকদের কাছ থেকে আয় হওয়া অর্থের পরিমাণ ছিল ১৬ হাজার ৫৮৪ কোটি টাকা। টাকার এই পরিমাণ ২০১৯ সালে বেড়ে হয়েছে ১৯ হাজার ৮৩১ কোটি টাকা। একইভাবে, ২০১৮'র ডিসেম্বরে আয় হয়েছিল ১৯ হাজার ৪৭৪ কোটি টাকা, যা ২০১৯-এর ডিসেম্বরে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২২ হাজার ৬১৭ কোটি টাকা।

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে ৩৭০ ধারা বাতিলের এক মাস পর ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে আগত বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছরের ওই একই মাসের তুলনায় ৪.৩ শতাংশ এবং বিদেশি মুদ্রা আয়ের পরিমাণ ১১ শতাংশ বেড়েছে।

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যবাহ প্রদীপ চন্দ্র অধিকারীর মাতৃদেবী সুশীলা অধিকারী গত ১০ জানুয়ারি দুর্গাপুর খণ্ডের হাসুয়া গ্রামে পরলোকগমন করেন মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি ৪ পুত্র, ৫ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

বোড়ো চুক্তি অসমের একতা ও অখণ্ডতাকে আরও মজবুত করবে : প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অসমে শান্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বোড়ো চুক্তিকে এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বোড়ো চুক্তিকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ও সবকা বিসওয়াস' এবং 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। একগুচ্ছ ট্যুইটে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ''আজ ভারত যেমন পূজনীয় বাপুকে তাঁর পুণ্যতিথিতে স্মরণ করছে, তেমনই অসম শান্তি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক অধ্যায়ের সূচনা প্রত্যক্ষ করছে। অর্ধ শতাব্দী অপেক্ষার পর বোড়ো জনগণের সঙ্গে এই চুক্তি এক নতুন যুগের সূচনা করেছে। এই চুক্তি অসমের একতাকে সুদৃঢ় করবে, উন্নয়ন নিয়ে আসবে এবং এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সূচনা করবে। বোড়ো সংগঠনগুলির সঙ্গে এই ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরের পর আমাদের সরকারের সর্বাধিক অগ্রাধিকার হলো বোড়ো অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন। ১ হজার ৫০০ কোটি টাকার এক সুসংবদ্ধ প্যাকেজের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। আমাদের বিশেষ নজর থাকবে বোড়ো জনজাতির মানুষের জীবনযাপনের মানোন্নয়নের ওপর যাতে তাঁরা সরকারি কর্মসূচিগুলির পূর্ণ সুফল পান।

শান্তির লক্ষ্যে আমাদের সঙ্গে বোড়ো জনজাতির মানুষের হাত মেলানো সুস্পষ্টভাবে এই বার্তাই দেয় যে, আমরা যখন হিংসার পথ পরিহার করে, গণতন্ত্র তথা সংবিধানের ওপর আস্থা রাখবো, তখন সবরকম সমস্যার সমাধান সম্ভব। আমি বড়ো জনজাতির বন্ধুদের মূলস্রোতে ফিরে আসার জন্য স্বাগত জানাই। বোড়ো অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আজ পূজ্য বাপুর পুণ্যতিথিতে পাঁচ দশক পুরনো বোড়ো

সমস্যার সমাধানসূত্র মিলেছে। বোড়ো গোষ্ঠী এবং সরকারের মধ্যে এই চুক্তি অসমের একতা ও অখণ্ডতা আরও সুদৃঢ় করবে। হিংসার পথ পরিহার করে এবং গণতন্ত্র তথা সংবিধানের প্রতি আস্থা বজায় রাখার জন্য বোড়ো বন্ধুদের এই সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। অসম ও দেশের হিংসা কবলিত অন্যান্য এলাকার জন্য বোড়ো বন্ধুদের সঙ্গে এই চুক্তি এক স্পষ্ট বার্তা দেয়। দেশের উন্নয়ন তখনই গতি পায়, যখন হিংসা ও ভয়মুক্ত এক পরিবেশ গড়ে ওঠে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আমার বোড়ো বন্ধুদের যাবতীয় প্রাণশক্তি অসমের উন্নয়নকে আরও সুদৃঢ় করবে। অসমের অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বার্থ সুরক্ষিত রেখেই বোড়ো বন্ধুদের সঙ্গে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটা সকলের জয়, এটা মানবতার জয়। 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ ও সবকা বিসওয়াস' এবং 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত-এর মন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।''

শৌচালয় ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের নতুন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ খোলা স্থানে শৌচকর্ম বন্ধ করে শৌচালয় ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় অর্থ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমণ সংসদে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করার সময় বলেন, তরল বর্জ্য এবং অপরিচ্ছন্ন জল ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আরও কাজ করতে হবে। কঠিন বর্জ্য সংগ্রহ, উৎসে সেগুলির পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার পর তার পুনর্ব্যবহরের ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই কারণে ২০২০-২১ অর্থবর্ষে স্বচ্ছ ভারত মিশনে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ধরা হয়েছে ১২,৩০০ কোটি টাকা।

শ্রীমতী সীতারমণ জানান, ঘরে ঘরে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে জল জীবন মিশনের জন্য ৩ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব এই বাজেটে করা হয়েছে। এর ফলে, স্থানীয় জলের উৎসের ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ, বৃষ্টির জল সংরক্ষণ এবং জলকে লবণমুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হবে। ২০২০-২১ অর্থবর্ষে-এর জন্য ১১,৫০০ কোটি টাকা অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।

রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি নতুন দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার প্রাপকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। রাষ্ট্রপতি ২২ জানুয়ারি এই পুরস্কার প্রদান করেন। সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে এইসব পুরস্কার প্রাপকরা অংশগ্রহণ করে।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৪৯ জন পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে সরকার প্রতি বছর এই পুরস্কারগুলি দিয়ে থাকে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই শিশুদের নজরকাড়া সাফল্যের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কম বয়সে তারা যে কাজগুলো করেছে, তা অনবদ্য। তিনি বলেন, ''সমাজ ও দেশের প্রতি তোমরা যেভাবে তোমাদের কর্তব্য পালন করেছো, তা জেনে আমি গর্বিত। আমি যখন আমাদের তরুণ বন্ধুদের

জম্মু ও কাশ্মীর, মণিপুর এবং অরুণাচল প্রদেশ থেকে একজন রয়েছেন। শিল্প ও সংস্কৃতি, উদ্ভাবন, শিক্ষা, সামাজিক ক্ষেত্র, খেলাধুলা এবং সাহসিকতা— এইসব ক্ষেত্র থেকে শিশুদের বাছাই করা হয়েছে। দেশ গঠনের কাজে অন্যতম অংশীদার হিসেবে সরকার শিশুদের ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়। এই লক্ষ্যে শিল্প ও সংস্কৃতি, উদ্ভাবন, শিক্ষা, সামাজিক ক্ষেত্র, খেলাধুলা এবং সাহসিকতায় নজরকাড়া সাফল্যকে স্বীকৃতি দিতে

সাহসিকতা ও সাফল্যের ঘটনাগুলি জানতে পারি, এগুলি আমাকে আরও কঠোর পরিশ্রম করার শক্তি জোগায়। রূঢ় বাস্তবের সঙ্গে দৃঢ় যোগাযোগ রেখে প্রধানমন্ত্রী এইসব ছেলে-মেয়েদের কঠোর পরিশ্রম করার পরামর্শ দেন— 'আরও সাফল্যের সূত্রপাত হোক এই স্বীকৃতি এবং তোমাদের বুঝতে হবে এর মাধ্যমেই প্রয়াস শেষ হবে না। তোমার এই পুরস্কার প্রাপ্তি তোমাদের বন্ধু-বান্ধব-সহ অন্যদের অনুপ্রেরণা জোগাবে।'

সন্ত্রাস-ভীতি দমনে সার্ক রাষ্ট্রগুলিকে একজোট হওয়ার আহ্বান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সীমান্ত পারের সন্ত্রাসের প্রেক্ষিতে যোগ্য জবাব দিতে ভারত সবদিক থেকে সক্ষম। ২০১৬ ও ২০১৯-এর জঙ্গি কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গৃহীত অভিযানগুলি সন্ত্রাসবাদ দমনে ভারতের দৃঢ় অঙ্গিকারকেই প্রতিফলিত করে। আজ নতুন দিল্লিতে ইন্সটিটিউট ডিফেন্স স্টাটিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিস প্রতিষ্ঠানে দ্বাদশ দক্ষিণ এশীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংহ। ভারতের অবস্থানের কথা পুনরায় উল্লেখ করে শ্রী সিংহ বলেন, আলাপ আলোচনা ও সন্ত্রাস একসঙ্গে চলতে পারে না। পাকিস্তানের মাটি থেকে ভারতের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য দায়ী জঙ্গি গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সে দেশকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলেন তিনি।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আরও বলেন, আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য যৌথ প্রয়াস গ্রহণের জন্য ভারত প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনায় সক্রিয়ভাবে শামিল হয়েছে। সন্ত্রাস ভীতি দূর করতে তিনি সার্ক দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস গ্রহণেরও আহ্বান জানান। পাকিস্তান বাদে অন্যান্য সার্ক রাষ্ট্রগুলি একে অপরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার এবং সীমান্ত পারের সন্ত্রাসে মদত না দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। কোনো দেশের নাম উল্লেখ না করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, কেবল একটি দেশের আচরণ ও নীতির দরুন সার্কের পূর্ণ সম্ভাবনা বাস্তব রূপ পায়নি। কেবল ওই দেশটির জন্যই সার্ক দেশগুলির মধ্যে মোটরগাড়ি চলাচল সংক্রান্ত চুক্তিটি বাস্তবায়িত হতে পারেনি। ওই দেশটি রাষ্ট্রীয় নীতির অঙ্গ হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে ব্যবহার করে আসছে। তিনি বলেন, বিদেশ ও নিরাপত্তা নীতির মাধ্যম হিসেবে সন্ত্রাসবাদকে কাজে লাগানোর ফলে এই অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদ এবং মৌলবাদ বেড়েছে, যা অন্যান্য দেশের নিরাপত্তার কাছে সংকটজনক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। ভারতের মুম্বাই, পাঠানকোট, উরি ও পুলওয়ামাতে জঙ্গি আক্রমণের স্মৃতির কথা উল্লেখ করে শ্রী সিংহ বলেন, এই ঘটনাগুলি সবই প্রতিবেশী একটি দেশের রাষ্ট্র মদতপুষ্ট সন্ত্রাসমূলক কাজকর্মের নজির। এই অঞ্চলে ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে বড়ো দেশ হিসেবে ভারত সর্বদাই প্রতিবেশীদের সঙ্গে সমৃদ্ধির প্রসারে কাজ করেছে।

ভারী বোঝায় হালকা শিক্ষা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

বিজ্ঞান ও প্রকৃতির চিরায়ত নিয়মেই শিশু মাতগর্ভে আসে। সময়ের পরিক্রমায় ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। মাতৃগর্ভে তার একটি স্বতন্ত্র সত্তা সৃষ্টি হয়। ওই জীবন্ত সত্তা গর্ভের ভেতরে তার মতো করে একটি কাল্পনিক পৃথিবী তৈরি করে নেয়। প্রসেডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস (পিএনএএস) ফ্রান্সের গবেষণালব্ধ ফল থেকে বলা যেতে পারে, 'মাতৃগর্ভেই শিশুদের শোনার ক্ষমতা ও ভাষার দক্ষতা তৈরি হয়'। এর মানে হচ্ছে শিশুরা জন্মের আগেই কল্পনা থেকে চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটাতে পারে। চিন্তার মাধ্যমে মেধা গড়ে ওঠার বিষয়টির বিবেচনা করে থাকে। এ নিয়ে তাদের গবেষণাও রয়েছে। এ সময় ইজরায়েলি মায়েরা গণিতের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেন, পিয়ানো বাজান ও বিশেষ ধরনের খাবার খেয়ে থাকেন। সবকিছু বিজ্ঞানমনস্ক ধারণা থেকে এসেছে। এই বিষয়গুলো শিশুদের মেধাশক্তির যেভাবে বেড়ে ওঠার কথা, এর থেকে বেশি পরিমাণ বাড়াতে পারে।

আমাদের দেশের আগামী প্রজন্মকে মেধাবী করে গড়ে তুলতে এই ধরনের গবেষণালব্ধ ফলগুলো প্রযোগ করা যেতে পারে। এর সঙ্গে আমাদের শিক্ষাকে বাস্তব ও জীবনমুখী করে গড়ে তুলতে হবে। ক্রিটিক্যাল থিংকিং যাতে এই শিক্ষা পদ্ধতিটির মাধ্যমে বাড়ানো যায়, এ বিষয়টিও বিবেচনায় রাখতে হবে। শিক্ষা পদ্ধতি আনন্দদায়ক হলে এটি আরও সহজ হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'যে শিক্ষায় আনন্দ নেই, সে শিক্ষা মূল্যহীন।' আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনার মেলবন্ধন ঘটানো যায়নি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষার ভাবনার সারবস্তু ছিল নান্দনিকতা, মানবিকতা ও আনন্দের সঙ্গে শিক্ষালাভ। কেবল পুঁথিগত শিক্ষা নয়, প্রকৃত জ্ঞান অর্জনকেই তিনি শিক্ষার মূল শক্তি হিসেবে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

দুঃখের বিষয় হচ্ছে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় মানবিকতা, সহনশীলতা ভ্রাতৃত্ববোধ, নান্দনিকতা ও আনন্দযোগের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। মনন সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে সৃজনশীল চিন্তাশক্তি মানুষের আত্মার ভেতর থেকে বের করে আনার জন্য রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-ভাবনার উপর ব্যাপক গবেষণা করে তা আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

আমাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় কোনো স্থিতিশীলতা নেই। শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে এত বেশি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে যে তাতে শিক্ষা তার প্রকৃত স্বরূপটি অর্জন করতে পারেনি। শিশুদের ওপর বইয়ের বোঝা এমন ভাবে চাপানো হয়েছে যে তা শিশুর মনকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করেছে। কোন বিষয়ের পর কোন বিষয়গুলো আসা উচিত, এর কোনো পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গি নেই। বইয়ের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও সৃষ্টিশীলতা নেই। বই লেখার ক্ষেত্রে কোনো ধারবাহিক গবেষণা নেই। সৃজনশীল পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষা পদ্ধতির কথা বলা হলেও বইয়ের মধ্যে এর বাস্তব প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় ঠিক উল্টো বিষয়টি ঘটছে। এর কারণ হলো, সৃজনশীল শিক্ষাপদ্ধতি উচ্চস্তরের শিক্ষায় নেই। এতে উচ্চশিক্ষা স্তরে এসে আমরা প্রকৃত মেধাবীদের মূল্যায়নের পরিবর্তে মুখস্থকেন্দ্রিক শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করছি। শিক্ষার প্রারম্ভিক স্তরে আচরণগত প্রেক্ষাপট এবং বাস্তবজীবনকে জানা ও বোঝার মতো শিক্ষা উপাদানগুলোর রাখার কথা থাকলেও তা নেই। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে শিক্ষার একটি আনন্দদায়ক ও মননশীল যোগসূত্র রয়েছে, কিন্তু এর কোনো প্রতিফলন শিক্ষাব্যবস্থায় দেখা যাচ্ছে না। নিজের মতো করে ছবি আঁকা, গান গাওয়া, কবিতা বলা— এগুলো আমাদের শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত নেই। আনন্দ নেই, হাতে কলমে শেখার কিছু নেই। সবকিছুই যেন করা হচ্ছে শিশুর মন নিষ্পেষিত করার মাধ্যমে তার ভেতর ও বাইরের অমিত জ্ঞানস্পৃহা থামিয়ে দেওয়ার জন্য। আমাদের শিক্ষায় উদারতা ও মানবতার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে। আমরা সবাই মানুষ এই বোধশক্তি প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে দেখা যাচ্ছে না। শিক্ষা মানুষকে উদার ও মুক্ত বুদ্ধিসম্পন্ন করার পরিবর্তে সংকীর্ণ মনোভাবাপন্ন করে গড়ে তুলছে। শিক্ষার সঙ্গে শিক্ষার্থীর মনের যোগসূত্র ঘটছে কিনা, সেটি ভেবে দেখা হচ্ছে না, কিংবা শিশুদের মনে শিক্ষার প্রভাব মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে না।

এক ধরনের অসংলগ্ন মানসিকতা মানুষকে স্বার্থপর করে গড়ে তুলছে। এই স্বার্থপরতা কর্মজীবনে তাকে অনৈতিক করে তুলছে। এত প্রতিবন্ধকতা জয় করে গবেষণার মাধ্যমে আমরা যদি শিক্ষার স্থিতিশীল স্বরূপটি বের করে আনতে পারি, তাহলেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হবে। এখানে স্থিতিশীলতা মানে থেমে থাকা নয়। পরিবর্তনের সঙ্গে ধীরে ধীরে খাপ খাইয়ে নেওয়া। ■

সা প্তা হি ক রা শি ফ ল

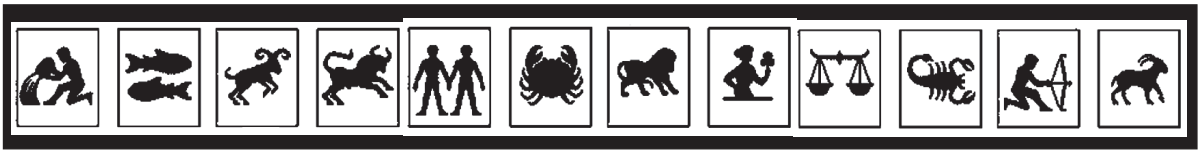

১০ ফেব্রুয়ারি, (সোমবার) থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি (রবিবার) ২০২০। সপ্তাহের প্রারম্ভে মিথুনে রাহু, ধনুতে মঙ্গল, বৃহস্পতি, কেতু, মকরে শনি, রবি, কুম্ভে বুধ, মীনে শুক্র। পুনরায় ১৩-০২ বৃহস্পতিবার, দুপুর ২টো ১৪ মিনিটে রবির কুম্ভে প্রবেশ। রাশি নক্ষত্র পরিক্রমায় চন্দ্র সিংহে মঘা নক্ষত্র থেকে বৃশ্চিকে অনুরাধা নক্ষত্রে।

মেষ : স্বীয় প্রতিভার দ্যুতি বিচ্ছুরণে বিত্ত, বৈভব, পাণ্ডিত্য। মিষ্টতা, শ্রী ও সুন্দরের স্নেহসুধায় প্রেমিক-প্রেমিকার পরিপূর্ণ আত্মমগ্নতায় তৃপ্তি ও আনন্দলাভ। কর্মক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশে ধৈর্য ও সংবেদনশীলতায় সাফল্য। প্রবাসী আত্মীয়ের আগমনে তৃপ্তি তবে ব্যয়াধিক্যে মানসিক উদ্বেগ।

বৃষ : বিদ্যার্থীর পড়াশোনায় মনোনিবেশ প্রয়োজন। অনেক প্রকল্প নব উদ্যোগে এগিয়ে নিতে চাইলেও সাফল্য অধরা থাকবে। অগ্রজের কর্মস্থানে উচ্চপদ লাভ ও আভিজাত্য গৌরব। বিড়ালতপস্বী বন্ধু থেকে ও বিনিয়োগে বিরত থাকুন। অর্থনৈতিক দুরবস্থায় আত্মবিশ্বাস অটুট রাখুন। সন্তান-সন্ততির শিক্ষা সমাপনান্তে নতুন কর্মলাভের সম্ভাবনা।

মিথুন : জ্ঞান, বিদ্যা, সৃজনশীলতায় উৎসাহ উদ্দীপনায় সুখকর ও উজ্জ্বলতর জীবন। স্বজন বাৎসল্য ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে ব্যয়াধিক্য ঘটলেও হঠাৎ প্রাপ্তিতে অর্থনৈতিক সাবলীলতায় অন্তর পুলকিত হবে। ভ্রাতা-ভগ্নীর প্রতিষ্ঠা ও সন্তান-সন্ততির মনের আশা পূরণের যোগ। কর্মসূত্রে একাধিক ভ্রমণ ও পিতার অসুস্থতায় উদ্বেগ। পুরনো প্রেমে জটিলতা।

কর্কট : শিক্ষার্থীদের মনসংযোগ ও অধ্যবসায়ের অভাব। প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি। ব্যবসায় বিনিয়োগে বিরত থাকা শ্রেয়। ভূসম্পত্তি থেকে অর্থলাভের সম্ভাবনা। বেতার, দূরদর্শন, চলচ্চিত্র, ভাস্কর্য শিল্পীদের প্রতিভার ব্যাপ্তি, সম্মান, যশ ও প্রতিষ্ঠা। বাত, শ্লেষ্মা, টাইফয়েডে সুচিকিৎসার প্রয়োজন।

সিংহ : চালাকি ও কৌশলী, রহস্যময় কর্মস্থানে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ও সম্মানহানির আশঙ্কা। প্রেম-ভালবাসায় নৈরাশ্য। ব্যবসা ও জীবনসঙ্গীর স্বাস্থ্যে নজর রাখা ও গুপ্ত শত্রু থেকে সতর্ক থাকুন। সপ্তাহের শেষ ভাগে পুলিশ, সামরিক, বিএসএফ, ক্রীড়াবিদের বিশেষ সম্মান লাভ। বিজাতীয় সংস্পর্শে কর্ম ও ভাগ্যক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের সুযোগ প্রাপ্তি।

কন্যা : আর্থিক অপ্রতুলতা, পুরানো সমস্যার পুনরুত্থান, কর্মস্থানে অস্বস্তিকর পরিবেশ। অবাধ্য পুত্র-কন্যার কারণে মানসিক দুশ্চিন্তা। স্ত্রীর কর্ম সংক্রান্ত শুভ সংবাদ এবং পদোন্নতির সম্ভাবনা। ক্রয়-বিক্রয়, জলপথে ভ্রমণ। উত্তেজনাকর পরিবেশ এড়িয়ে চলুন। সপ্তাহের প্রান্তভাগে জীবনবেদনার অবসানে নব-প্রেরণাময় শক্তিসঞ্চার।

তুলা : অনিদ্রা, মাথাব্যথা, চোখের সমস্যা, অসৎসঙ্গ। প্রলোভনে চিত্তবৃত্তি নষ্ট। স্ত্রী ও সন্তানের বাচালতা, জেদ, ঔদ্ধত্যে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি হৃদয়বিদারক ও জীবিকার্জনে নেতিবাচক প্রভাব। সপ্তাহের শেষভাগে প্রতিবেশী ও সুধীজনের সান্নিধ্যে মানসিক পীড়ার অবসানে দৈবীকৃপা লাভ।

বৃশ্চিক : ছিদ্রান্বেষী ঈর্ষাকাতর বয়স্ক মিত্রের কারণে সাংসারিক অশান্তি, প্রিয়জনের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত আঘাত। কর্মক্ষেত্রে নিজ দক্ষতা ও নিষ্ঠায় সাফল্য তবে প্রাপ্তির ভাণ্ডার আশাব্যঞ্জক নয়। পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। চলতি সপ্তাহে মাতার স্বাস্থ্য এবং পরীক্ষার্থীদের জন্য হিতকর নয়।

ধনু : বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা, ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কর্মক্ষেত্রে সুনাম, যশ, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি, গৃহ ও মাতৃসুখ, পুত্রের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি, ভবিষ্যৎ চিন্তার অবসান। সাহিত্য পিপাসুদের প্রতিভার নব উন্মেষ ও সম্ভ্রম। পিতৃ বিত্ত লাভ, সমাজকল্যাণে মিত্র সহায়তা, ভ্রাতৃবিরোধে মানসিক ক্লেশ, ভাবাবেগ পরিহারে বাস্তববাদী হোন। আয়-ব্যয়ের সমতারক্ষা করুন।

মকর : ব্যবসা ও কর্ম বাধার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন। আয়ের শ্লথগতি, নারী জাতিকাদের চমকপ্রদ ঘটনায় হৃদয়ের হিল্লোল ও দূরদর্শিতায় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সুযোগ। ব্যবসায়ীদের ঋণ গ্রহণ ও সন্তানের আত্মপ্রতিষ্ঠায় আনন্দ। সপ্তাহের মাঝামাঝি সময়ে আলস্য, আরামপ্রিয়তা, কল্পনার জগতে সময় অতিবাহিত হলেও অচিরেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার হবে কোনো রমণীর সহযোগিতায়।

কুম্ভ : অসুস্থতা, বিসদৃশ আচরণ, বিবাদ-বিতর্ক, স্বজন বিরোধ, স্থানান্তর, ধৈর্যচুতি, মানসিক অবসাদ, একাকিত্ববোধ। তবে সপ্তাহের প্রান্তভাগে জীবনসঙ্গীর ব্যবহার ও কর্মকুশলতায় সুখ্যাতি ও শ্রীবৃদ্ধি এবং উপার্জনের দ্বিবিধ ধারায় প্রসারিত হস্ত। বেকারদের কর্মসংস্থান ও পুত্র কল্যাণে বৈভব।

মীন : কর্মক্ষেত্রে চাপ, ব্যস্ততা সত্ত্বেও সহকর্মীর সহায়তা, দক্ষতা ও বাস্তবতায় সৃজনশীল পরিকল্পনায় সাফল্য। শিক্ষার্থী, কর্মপ্রার্থী, গবেষকদের অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ ও সুধীজনের সুধাময় দৃষ্টিতে সাফল্য। কর্মসূত্রে প্রবাস। পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, সম্পত্তি বিষয়ক জটিলতার অবসান। পরোপকারের প্রচেষ্টা সার্থক আড়ম্বরের সঙ্গে বিবাহ প্রার্থীর অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

● *জন্ম ছকের স্বাতন্ত্র্য ও দশা-অন্তর্দশা না জানায় কেবল গোচর ফল বর্ণিত হলো।*

—শ্রী আচার্য্য